GIFT

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ২০১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন

গবেষক

মোঃ জামাল উদ্দিন খান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ৪৬/২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
465879
465879

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর- ২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০১২

২৭/১১/১২

মোঃ জামাল উদ্দিন খান
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৪৬
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465879

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr.Md.Akhteruzzaman
Associate Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

সূত্র :

তারিখ : ২৭-১১-২০১২

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জামাল উদ্দিন খান, এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে "ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পাণ্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত গবেষণার সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে এম. ফিল ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে গবেষণাটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

27.11.12

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465870

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় "ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন " শীর্ষক এম. ফিল গবেষণাটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে গবেষণাটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শানে দরুদ ও সালাম পেশ করছি। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় গবেষণাটি মানসম্পন্ন হয়েছে। এজন্য আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী । আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এর প্রতি, কারণ তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আমাকে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে এবং পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সাথে সাথে আমার বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় জান্নাতবাসী মা মরহুমা কোহিনুর বেগমকে। যিনি ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ইন্তেকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। যার দোয়া-ই আমার জীবন চলার পাথেয় এবং সৎ কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায়। যিনি আজীবন আমাদের সুখের জন্য নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের সৎ মানুষ ও সৎ পথে চলার জন্য তিনি সবসময় আমাদের সৎ উপদেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান-কে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের মানুষ করেছেন। তাঁর সৎ উপদেশ, সততা নিষ্ঠা আমাকে এখনো সৎ পথে চলতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবার দোয়া এবং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের রহমতের কারনেই আজ আমি জীবনের এতদূর পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এই স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের দরবারে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা এবং বাবার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি এবং জান্নাত বাসী করার জন্য দোয়া করছি। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল-আলামীন তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুণ। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

আজ আমি স্মরণ করছি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী জয়নব আক্তার লিজাকে। কারন আমাদের নতুন বিবাহ হবার পরেও সে আমাকে সর্বদা দোয়া করেছে এবং সব সময় গবেষণার বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছে। আমি তার মঙ্গল কামনা করি সে যেন মানবজাতির খেদমত করতে পারে।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় কাকা মোঃ সিহাব উদ্দিন খান এবং শ্রদ্ধেয়া কাকী মিসেস নাসিমা খানমকে, তাঁরা নিজেরা অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। আমি তাঁদের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু এবং ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তি কামনা করি। তাঁরা যেন মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারেন। আমি তাঁদের দু'ছেলে তমাল ও তাহসিনকে দোয়া করি তারা যেন বড় হয়ে ঈমানদার, নামাযী ও ইসলামের খেদমতদার হয় এবং মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত থাকে।

এছাড়া আমি আমার বন্ধু মোঃ রুহুল আমীনকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করবনা। কারণ সে বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যে যে বিষয়ের উপর দেশি এবং বিদেশি লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি সে সব লেখকবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাদের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি কামনা করি।

মোঃ জামাল উদ্দিন খান
গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

স.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	আলাইহিস সালাম
রা.	=	রাদিয়ালাহু আনহু
র.	=	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ইং	=	ইংরেজি
বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরি
খ্রি	=	খৃষ্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
তা.বি	=	তারিখ বিহিন
খ.	=	খন্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
p.	=	Page
pp.	=	Pages
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.
Op.cit	=	Operae-citrae
Ed.	=	Edited / Editor

Dhaka University Institutional Repository

আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবি	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য

আরবি	=	বাংলা
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়:

সামাজিক নিরাপত্তার ধরন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১ম পরিচ্ছেদ : ধরন ৪

২য় পরিচ্ছেদ : প্রকৃতি ৭

৩য় পরিচ্ছেদ : বৈশিষ্ট্য ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়:

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ক্ষেত্র ও পরিসীমা

১ম পরিচ্ছেদ : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ১৪

২য় পরিচ্ছেদ : ক্ষেত্র ও পরিসীমা ২৯

তৃতীয় অধ্যায়:

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব ও বিকাশ

১ম পরিচ্ছেদ : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব ৪৭

২য় পরিচ্ছেদ : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ ৫২

চতুর্থ অধ্যায়:

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশ্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি

১ম পরিচ্ছেদ : বিশ্বজনীন মানবতাবাদ ৬৯

২য় পরিচ্ছেদ : সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি ৭২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়:

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা প্রথা ও প্রতিষ্ঠান (যাকাত,বায়তুলমাল,উশর,ওয়াকফ ও অন্যান্য)

১ম পরিচ্ছেদ : যাকাত ৭৯

২য় পরিচ্ছেদ : বায়তুলমাল ১১২

৩য় পরিচ্ছেদ : উশর ১২৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ ১২৮

৫ম পরিচ্ছেদ : অন্যান্য ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ১৩৮

উপসংহার ১৫০

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় সমাজের নাগরিকগণকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে মূলত যেকোন প্রতিকূল অবস্থা হতে সমাজের নাগরিকগণকে রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে বুঝায়। নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা। সে অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হল এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সমাজবাসীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা। যেমন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, মৃত্যু, বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পানিতে ডুবে মারা যওয়া, রাস্তায় যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, এছাড়া যে কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে তা সব-ই সামাজিক নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার কারণ এবং এসকল সমস্যা থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করে নিরাপত্তা দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তা। আবার সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়। মূলত যে সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগে মানুষ নিজের সম্পদ, সামর্থ, বুদ্ধি ও দুরদর্শিতার মাধ্যমে মুকাবিলা করতে পারেনা, সে সব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হলো সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখা।

আধুনিক সমাজে সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশে ইসলামের অবদান সর্বাধিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্ত্বা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উন্নয়ন এবং কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, অসহায়কে সাহায্য দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ দান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি প্রদর্শনকে অতি মাত্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পারিক বিপদাপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে।

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে স্বাধীনভাবে এবং মান মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে পরোপকার, জনসেবা, দানশীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ও অনুপ্রাণিত করে। ধনী দরিদ্র প্রত্যেক সামর্থ ও সক্ষম মানুষকে এ কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানায়। ধনী ব্যক্তি যেমন নিজের ধন সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে জনসেবা ও জনকল্যাণে কাজ করবে, দরিদ্র ব্যক্তিও তেমনি নিজের শারিরীক শক্তি সামর্থ, মুখের ভাষা ও মনের দরদ, চিন্তা ও সেবা দিয়ে এক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখতে পারে। এভাবে ইসলাম জনসেবা জনকল্যাণ, পরোপকার, সদকা বা পূণ্য কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌছে দেয়া কারো আর্থিক অবস্থা তার সমাজের কল্যাণের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইসলাম মানুষকে মানব প্রীতির এত উঁচু স্তরে উন্নীত করে যেখান থেকে সৎ ও পূণ্য কর্মের প্রেরণা, উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌছে যায়। ফলে এই উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষের আবেগপ্রবণ মনকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। এ মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য তথা নিজের কল্যাণের চিন্তা না করে দানশীল হয় এবং নিজের সঞ্চিত ধন সম্পদ দুঃস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করে। এভাবে ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কল্যাণমুখী করে তোলে। এরূপ মানুষের বিশ্বাস,ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, সেই মানবতাবোধের তাগিদেই মানব সমাজে গড়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের অন্তর্ণিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সেটাই ইসলাম। এজন্যই ইসলামে দরিদ্র ও আর্তদের সেবা দান, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব পালন, দানশীল হওয়া, যাকাত দান ও সমবেত ভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলের সম অধিকার দান ও ভোগ করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পালনের জোরালো নির্দেশ রয়েছে। ইসলাম এভাবেই সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে মানুষকে অনুপ্রানিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, সে জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। যাকাত ব্যবস্থাই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার বাস্তবয়নের ফলে গড়ে উঠেছে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

ইসলামের আরেকটি সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান হলো বায়তুলমাল। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্ত বায়নের জন্য নবী করীম (স.) রাষ্টের জন্য সরকারি অর্থভান্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভান্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বায়তুলমাল বলা হয়। এর মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্টীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে আরও একটি ব্যবস্থা হল ওয়াক্ফ। সাধারণত কোন ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোন মুসলিমের সহায় সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ওয়াক্ফ বলে। এ মাধ্যমে মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কারয হাসানা হলো আরও একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপাদান। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনা সুদে ও শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদানের প্রথাকে কারয হাসানা বলে। পবিত্র কুরআনে এরূপ করয কে আল্লাহকে করয দেয়া বলা হয়েছে। ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এরূপ আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে সদকায়ে যারিয়া, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানির পশুর চামড়ার বিক্রয়লব্দ অর্থ দান, ওশর ও খারাজ অন্যতম। ইসলামের এ সব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম মানব সমাজের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমূখী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বায়তুলমাল ব্যবস্থা। বিশ্বের সকল দরিদ্র আইন এবং নিরাপত্তা কর্মসূচির পথপ্রদর্শক ও ভিত্তি হিসেবে বায়তুলমালকে আখ্যায়িত করা হয়। বায়তুলমালের আদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতে পৃথিবীর সব দেশে জনকল্যাণ বিভাগগুলো পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে বায়তুলমালের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইসলামের শুরু থেকেই যে পুরুষ বা নারী তার মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম বা অপারগ তার চাহিদা পূরণ করার দয়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রই নিয়েছিলো। ইসলামে যাকাতকে ফরয করা হয়েছে। যাকাত হলো ইসলামে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তার প্রথম প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক মোট আয়ের নেছাব পরিমাণ অর্থ বাদে বাকি অংশের ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিম নর-নারীর উপর অবশ্যপালনীয়। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো যাকাত গ্রহণ এবং তা বন্টণের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক নিরাপত্তা সম্মন্ধে ইউরোপিয়রা যে চিন্তা বা ধারণা পোষণ করেন তা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা বা মস্তিস্ক প্রসূতও বলা যায়। কিন্তু ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাক কতৃক প্রদত্ত, যা কুরআন ও হাদিসে নির্দেশিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে " পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে , কেহ আল্লাহ্ ,পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব, এবং নবী-রাসূলগনের উপর ঈমান আনলে এবং গরীব আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, অভাবগ্রস্থ, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, আর্থিক সংকট, দুঃখ-ক্লেশ ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী (১১ঃ১৭৭)।"

উক্ত আয়াতে মুসলিমগণের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে তা তাদের পূরণ করা অপরিহার্য। কুরআনে গরীব ও অভাবী লোকদের সাহায্য প্রদান করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন সমাজের প্রতিটি উপার্জনক্ষম সদস্যকে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি জীবের প্রতি দয়ার মনোভাব পোষণ করার আহ্বান জানিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞাত (৩ঃ৯২)"।

মুসলিম সমাজে কোন মহিলা যদি অবিবাহিতা বা স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা হয় তাহলে তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব বর্তায় তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর যদি সে (মহিলা) উপার্জনক্ষম না হয়। ইসলামে ছেলে- মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা এবং দেখা-শুনার দায়িত্ব বাবা মায়ের। সন্তানরাও বাবা মায়ের বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দেখা-শুনা, সেবা-শুশ্রূষা করবে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সন্তান এবং পিতা-মাতা একে অপরের সম্পদ লাভ করে। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মত কোন কারণ না থাকলে কেহই তাদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ থেকে বিরত রাখতে পারেনা।

বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে দরিদ্র শ্রেণী, নিম্ন বেতনভূক্ত কর্মচারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং ঋণ সমস্যার সমাধানে বায়তুলমাল ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ প্রতি বছর যাকাত, ওশর, ফিতরা, সাদকা, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। পরিকল্পিত উপায়ে এসব অর্থ সংগ্রহ করে বায়তুলমালের ন্যায় তহবিল সৃষ্টি করা গেলে দারিদ্র বিমোচন, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ, পতিতা পুনর্বাসন, অক্ষম বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা যায়। বায়তুলমালের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তার ধরন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরাপত্তার ধরন

নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ রাখা, সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ হল প্রতিকুল অবস্থা হতে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা। সামাজিক নিরাপত্তা মূলতঃ এমন এক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যদ্বারা সমাজে বসবাসকারী সকল শ্রেণীপেশার মানুষের যাবতীয় প্রকারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং সেসময় হতে একগুয়েমি চিন্তা ধারার পরিবর্তে রাষ্ট্রের কল্যাণ-ধর্মী ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যাপকভাবে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র মানেই কল্যাণ রাষ্ট্র এবং এ আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক তার পরিবারের জন্য এক ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অনাকাংখিত ও অবাঞ্চিত অবস্থা উদ্ভাবের কারণে নাগরিকরা তাদের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখতে পারে না। এসময় রাষ্ট্র বা সমাজ বেশ কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য জীবনমান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। এসকল কর্মসূচিকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার সনদের পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, "প্রত্যেকেরই জীবন যাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখার অধিকার আছে যা তার নিজের এবং পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত এবং জীবনের যেসব ক্ষেত্রে এ মান বজায় থাকবে তা হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রয়োজনীয় সমাজসেবা ইত্যাদি এবং যেসব দূর্যোগে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার লাভ করবে তা হলো বেকারত্ব, অসুস্থতা, শারীরিক অক্ষমতা, বিধবা, বার্ধক্য বা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্যান্য পরিস্থিতির দরুন জীবিকা অর্জনের অক্ষমতা।"নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বিশেষ বিপদকালীন সময়ে বিপদ থেকে রক্ষার চেষ্টা করে।[১]

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে সমাজের বিপদগ্রস্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। যার সমর্থনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক আইনগত সহায়তা প্রয়োজন হয়। মূলতঃ দ্রুত পরিবর্তনশীল, শিল্পায়িত ও উন্নত প্রযুক্তির জটিল সমাজ ব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দারিদ্রতা,

---

১ ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সমাজ কর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স*, ২০০৩), পৃ. ৩৫-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন অক্ষমতা, বার্ধক্য, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পেশাগত দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য বিপদ আপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যান্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Charls I. Schottland বলেছেন-" সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে আইনি সহায়তাপুষ্ট এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচী যা অসুস্থতা, বেকারত্ব, উপার্জকারীর মৃত্যু, বার্ধক্য কিংবা অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা এবং দুর্ঘটনার কারণে যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তখন তার বা তাদের খরচ নির্বাহমূলক ব্যবস্থা"।[১]

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Maurice Stack বলেছেন-" সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক জীবনের ঐ সমস্ত আকস্মিক ঘটনা যেমন, অসুস্থতা, শিল্পদুর্ঘটনা, বেকারত্ব, বৃদ্ধকালীন নির্ভরতা, ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমাজ কর্তৃক গৃহীত এক রক্ষামূলক কর্মসূচি, যে অবস্থায় একজন ব্যক্তি তার নিজের সামর্থ ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে নিজের ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় না।"[২]

সামজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় William Beveridge বলেছেন-:বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দূর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়সে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের সময় অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে যখন কোন পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন যে কর্মসূচীর মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে"। তিনি আরও বলেন, " সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, অসুস্থতা, মলিনতা এবং অলসতা নামক পাঁচটি দৈত্যের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।"[৪]

অন্যদিকে 'সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে Rovert L. Barker (editor) সম্পাদিত The Social Work Dictionary' তে বলা হয়েছে 'সামাজিক নিরাপত্তা' হল-" সমাজের বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আয়

---

[১] " Social security is a program of protection provided byf social legislation against sickness, unemployment, death of wagearner, old age or disability dependency and accident-contingencies against wich the individual cannot be expected to protect himself." W. A. Friendlander, Introducation to social Welfare (NewDelhi, 5th edu., 1963), p.1.

[২] " Social security is a programme of protection provided by society against those contingencies of modern life-sickness, unemployment, oldage dependency, industrial accidents, and individualisms-against which the individual can not be expected to protect himself and his family by his own ability or foresight." Maurice Stack, in, Walter A. Friedlander, Introduction to Social Welfare (New Jersey, Printice-Hall. Inc, 19968), p. 5

[৩] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬.

[৪] "Social security is an attack on five giants namly Want, Ignorance, Disease, Squalor and Idleness,"

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা দেয়ার এক বিধান, যাদের আয় আইনগতভাবে সঙ্গায়িত দুর্ঘটনা বা বিপদ, যেমন-বৃদ্ধ অসুস্থ, তরুণ অথবা বেকার হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।[৫]

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বলা হয়েছে যে, "বৃহৎ অর্থে 'সামাজিক নিরাপত্তা' হচ্ছে সে ব্যবস্থা যাতে অসুস্থতা, বেকারত্ব, বৃদ্ধাবস্থা কিংবা কারো মৃত্যুজনিত কারণে যখন মানুষ সন্তোষজনক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয় তখন তা উপশম বা নিবৃত্তকরণের লক্ষ্যে গৃহীত এক ধরণের সরকারী সহায়তা।"[৬]

'সামাজিক নিরাপত্তা'র এক উল্লেখযোগ্য দিক হল আশ্রয়। সামাজিক নিরাপত্তা মুলতঃ মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালীন সময়ে দেয় হয়। সমাজের মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে আজীবনই অবদান রাখে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের এ কল্যাণে অবদান রাখতে গিয়ে অনেক সময়ই তারা বিভিন্ন ধরনের আকস্মিক বিপদেও সম্মুখীন হয় যা তাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। রাষ্ট্র বা সমাজ তাই এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হিসেবে এসব বিপদগ্রস্ত নাগরিকদেরকে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠাতে সাহায্য করে। Encyclopedia of Social Work in India (1967)-তে প্রদত্ত্ব সামাজিক নিরাপত্তা' বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশায় ব্যক্তিকে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেয়

সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা দুর্যোগজনিত কারণে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত (শারীরিক ও মানসিক) নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষ আইনী সহায়তায় যে নিরাপত্তামূলক বা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে ব্যবস্থাকে 'সামাজিক নিরাপত্তা'বলে।

---

৫ Robert L. Barker (ed.) *The Social Work Dictionary* (Washington D, C., NASW, Press), pp.355-56

৬ K. D. Gangrade, *Social Legislation in India* (Delhi, Concept Publishing Company, 19978), p-220

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি

আজকের আধুনিক শিল্প-সমাজে মানুষের জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক জীবন যাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ব, বেকারত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রতিটি সদস্যেরই কোন না কোন সময়ে আকস্মিকভাবে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ অক্ষম, কর্মহীন ও অকাল মৃত্যু বরণ করছে। এসব আকস্মিক ও শোচনীয় অবস্থার মোকাবেলা করে, জীবন ধারনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষেই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। 'সামাজিক নিরাপত্তা শুধু ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের উপায় নহে। এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকর উপাদান এবং পূর্বশর্তও বটে। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতার উপর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে। কিন্তু জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকির বিরুদ্ধে 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থা না থাকলে, সমাজের মানুষের নিকট থেকে নিঃস্বার্থ সেবা নিরলস সহযোগিতা আশা করা যায় না। এছাড়া নিরাপত্তাহীনতা মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে শ্রমবিমুখতার জন্ম দেয়। সুতরাং বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে 'সামাজিক নিরাপত্তা' কে মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি হল পরিকল্পিত ও সমন্বিত 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচি।[৭]

সামাজিক নিরপত্তার প্রয়োজনীয়তা

একটি স্বাভাবিক সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রথম শর্ত হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস। সত্যিকারের স্বাধীনতা হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কেননা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। যে দেশ যত বেশি দরিদ্র সে দেশে 'সামাজিক নিরাপত্তা' তত বেশি প্রয়োজন। কারণ অভাবের কারণে মানুষের অনেক সময় স্বভাব নষ্ট হয়। অতীতকালে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে, মানুষ তার পাপকার্যের শাস্তিস্বরূপ অভাব অনটনে ভোগে। ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা ও দুর্যোগ তার নিজের সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া হত এবং সেজন্য সে ব্যক্তিকেই দায়ী করা হত। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে এজন্য অনেকাংশে দায়ী তা বিবেচনা করা হত না। অনেক অদৃশ্য ব্যাপারে সমস্যা জড়িত ব্যক্তির হাত থাকে না যেমন বেকারত্ব, বার্ধক্য ও দুর্যোগ কেউ ইচ্ছা করে ডেকে আনেনা। কিন্তু এসব সমস্যার সম্মুখীন হলে পরিবারের লোকজনের ভরণ-পোষণের অসুবিধা হয় কারণ পরিবারের নিয়মিত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে, ব্যক্তি বিশেষ একা তার সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয় না। সমাজের দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তিরা সাধারণত সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন।

---

৭ মোঃ আতিকুর রহমান, *সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা: কুরআন মহল, ২০০১), পৃ. ৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আজকাল বিভিন্ন কারণে এসব সাহায্যের মাত্রা কমে যাচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে সাহায্য নেয়াটাও গ্রহীতার ব্যক্তিত্বে বাধে। মানুষ যখন সুস্থ অবস্থায় কাজে নিয়োজিত থাকে তখন সে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে। কাজেই সে যখন অসুবিধায় পড়ে তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সমাজের এগিয়ে আসা উচিত। সে যে সেবা পাবে তা গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবেই ভোগ করবে। যে দেশে মৃত্যুর হার বেশী ও আয়ুস্কাল কম সে দেশে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া কলকারখানায় যে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করে তারা নানাপ্রকার দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা তুফান, ঘুর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা তো অধিকাংশ দেশে লেগেই আছে।

যেসব দেশে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম এবং যেখানে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর অনেকে নির্ভরশীল সেসব দেশের অনেকের পক্ষেই সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারের অন্যান্য সব সমস্যের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় তারা অসহায় হয়ে পড়ে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের খুব একটা অসুবিধা হয় না। যৌথ পরিবার অনেকটা 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ব্যবস্থা করে। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত গ্রামের দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন লোকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে; কিন্তু বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। অনেক দানশীল ব্যক্তি বিশেষ করে ধর্মীয় নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার সমাজকল্যাণ মূলক কর্মসূচি চালিয়ে যেতেন। অনেক ক্ষেত্রে দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও এতিমখানা স্থাপন করে গরীব লোকদের সাহায্য করতেন কিন্তু বর্তমানে পল্লী এলাকায় বিত্তশালী ও দানশীল লোকদের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। ফলে 'সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে।

শ্রমিকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের উৎপাদন বাড়াতে হলে সুদক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমিকের প্রয়োজন। শ্রমিকদের যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তাদের মধ্যে যদি অসন্তুষ্টি বিরাজ করে, তাদের চাকুরীর নিশ্চয়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা'র ব্যবস্থা না থাকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর হয় তাহলে তারা স্বভাবতই উৎপাদন বাড়াতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ হবে না। কাজেই শ্রমিকরা যাতে সন্তুষ্টচিত্তে উৎপাদন বাড়াতে এগিয়ে আসে সেজন্য শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। সার্বিক কল্যাণের জন্য কারখানার পরিবেশের উন্নতি করা উচিত। কারখানায় আলো বাতাস, দুর্ঘটনার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, পানীয় জলের সরবরাহ, ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার, প্রস্রাব-পায়খানার ব্যবস্থা, সন্তোষজনক চাকুরির শর্তাবলী, বেতন ও ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, গোষ্ঠীবিমা, ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসার সুবিধা, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, বিনা ভাড়ায় বাসস্থান অথবা বাসা ভাড়া প্রদান, ন্যায্যমূল্যের দোকান, সমবায় সমিতি স্থাপন, কর্মী মেয়েদের জন্য মাতৃকল্যাণ সুবিধা, তাদের শিশুদের জন্য দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, শ্রমিকদের বাসস্থান হতে কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার জন্য যানবাহন বা যানবাহন ভাড়া প্রভৃতি সুয়োগ-সুবিধা শ্রমকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। এসব কর্মসূচি দেখাশুনা ও পরিচালনার জন্য কারখানায় শ্রমিক কল্যাণ অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন। সরকারী পর্যায়ে শ্রমিকদের চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে বেশী বেশী শ্রমিককেন্দ্র স্থাপন ও এ সকল কার্যাবলী সম্প্রসারণের মাধ্যমে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বিধান করা অত্যন্ত জরুরি।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তার তাৎপর্য এবং এর পরিধি বিভিন্ন দেশ ভেদে বিদ্যমান সামাজিক আইন, ঐতিহ্য এবং ধারার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কতিপয় দেশে 'সামাজিক নিরাপত্তা' হিসেবে শুধু আয়ের নিশ্চয়তাকে (Income security) ধরা হয়, পক্ষান্তরে অন্যদেশে 'সামাজিক নিরাপত্তা' হিসেবে নিরাপত্তা খাতকে অন্তর্ভূক্ত করে। এজন্য 'সামাজিক নিরাপত্তা'র প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকের অনুপস্থিতি রয়েছে। তদুপরি, সামাজিক নিরাপত্তার সার্বজনিন তিনটি রূপভেদ রয়েছে- ১, সামাজিক বিমা (Social Insurance) ২. সামাজিক সাহায্য (Social Assistance) ৩. সামাজিক সেবা (Social Service).[৮]

সামাজিক বিমা (Social Insurance) ঃ বিমা কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার মেরুদন্ড(Backbone of the social security plan) বলে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক বিমা বলতে সাধারণত শর্তাধীন চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে অবসর প্রাপ্তির কিংবা বিপদগ্রস্ত হলে বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিকে বোঝায়। তবে সামাজিক বিমার ক্ষেত্রে এর শর্তের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, "সামাজিক বিমা হচ্ছে বার্ধক্য, অক্ষমতা, উপার্জনকারীর মৃত্যু, বেকারত্ব, পেশা সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার মত সংবিধিবদ্ধ শর্তাধীন ঝুঁকির বিরুদ্ধে নাগরিকদের রক্ষার সরকারী কর্মসূচি।[৯] সামাজিক বিমা শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা কর্মসূচি। সামজিক বিমায় তহবিল গঠিত হয় শ্রমিকদের বেতনের দেয়া নির্ধারিত শতাংশ, মালিক কর্তৃক প্রদত্ত সমপরিমাণ অংশ ও কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অংশ নিয়ে। সামাজিক বিমা সরকার কর্তক প্রবর্তিত। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিককে কর্মসূচির আওতাধীনে কীরূপ আনা হবে, বিমার কিস্তির টাকা কত হবে, এ তহবিল কীভাবে পরচালিত হবে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সব কিছু সরকার কর্তৃক আইন পাশ করে ঠিক করা হয়। বলা যায় 'সামাজিক নিরাপত্তা' ধারণাটি শুরু হয় সামাজিক বিমার মাধ্যমে। জার্মান সরকারের চ্যান্সেলর বিসমার্ক ১৮৮৩-৮৪ সালে সর্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক বিমা হাতে নেন। সামাজিক বিমা প্রবর্তন করা হয় তিনটি ভাগে ১৮৮৩ সালে অসুস্থ বিমা, ১৮৮৪ সালে কর্মচারি আঘাত প্রাপ্ত বিমা এবং ১৯৮৯ সালের অক্ষমতা ও বৃদ্ধ বয়সের বিমা। ILO এর মতে, সামাজিক বিমা ব্যবস্থা সকল আয় উপার্জনকারীর জন্য বাধ্যতামূলক যার অর্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী, দক্ষ-অদক্ষ, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সকলের ক্ষেত্রে সামাজিক বিমা হল এমন এক প্রকার যন্ত্র (devices) যা কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা থেকে রক্ষা করে এবং উক্ত ব্যবস্থা ব্যক্তিদেরকে জরুরী অবস্থায় সহায়তা প্রদান করে। ফ্রিডল্যান্ডারের মতে, সামাজিক নিরাপত্তা' প্রোগ্রাম হিসেবে সামাজিক বিমার লক্ষ্য হল শিল্পায়িত গতিশীল সমাজে বিমাকৃত শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন ধরনের দৈব-

---

৮ Excyclopedia of Social Work I india, vol-2, p. 114

৯ R.L. Barker, The Social Work Dictionary: (NASW Press, 1995), p. 354

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যেমন-বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীরর মৃত্যু।[১০]

সামাজিক বিমা হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেদিক যাতে কোন ব্যক্তি তার সামর্থ ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নিজেকে ও তার পরিবারকে ভবিষ্যতে আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্কালে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। যেমন-শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বিমা ইত্যাদি। সাধারণত পরিকল্পনার মাধ্যমে এরূপ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

R.C.Saxena এর মতে, সামাজিক বিমা এমন একটি পদ্ধতি, যা ব্যক্তিকে দারিদ্র ও দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করে এবং জরুরি সময়ে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) সামাজিক বিমা সম্পর্কে বলেছে-" Social Insurance is a scheme of providing benefits for persons of small earnings granted as of right in amounts that combine and contribute efforts of insured with subsidies from the employer and the state."[১১]

বৃটেনের সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হচ্ছে জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, সমপরিমাণ চাঁদাভিত্তিক বিমা, বার্ধক্য ও অকর্মণ্য বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, অসুস্থতা বিমা, বেকারত্ব বিমা, শিল্পদুর্ঘনা বিমা ইত্যাদি। তাদের বিমা কর্মসূচিকে প্রধানতঃ চাকরিজীবী বিমা, আত্মকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবিমা এবং বেকারত্ব বিমা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। আমেরিকায় সকল কর্মজীবী মানুষই সামাজিক বিমার আওতাভূক্ত। তাছাড়া বেকারত্ব বিমা বৃদ্ধ বয়সে টিকে থাকা ও অক্ষমতা বিমা চালু রয়েছে। স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও বিশেষ ব্যবস্থায় সামাজিক বিমার সুবিধা পায়।[১২]

সামাজিক বিমা ও ব্যক্তিগত বিমার পার্থক্য ঃ সামাজিক বিমা ও ব্যক্তিগত বিমা একই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে বিমাকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত তহবিল থেকেই তাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু সামাজিক বিমা ও ব্যক্তিগত বিমার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সামাজিক বিমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং বিমা তহবিলে প্রদত্ব অর্থকে কিস্তি না বলে কর বলা হয়। সামাজিক বিমার আওতায় কিছু লোক তাদের প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকে । বিশেষ করে স্বল্প বেতনের লোকেরা তাদের দেয় অর্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে এবং সেজন্য একে সামাজিক বিমা বলা হয়। ব্যক্তিগত বিমায় বিমাকারী ব্যক্তি যেকোন ব্যক্তিকে বিমার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু সামাজিক বিমার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।[১৩]

---

[১০] Walter A. Friedlander, op.cit, 1963, p-114.

[১১] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সমাজকর্মেও প্রত্যয় ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ. ৪৬

[১২] রেজাউল করিম, *সামাজিকার্যক্রম সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন* (ঢাকা: রেডিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ.২২১

[১৩] *সমাজকল্যাণনীতি ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈশিষ্ট্য

সুদূর অতীতে অসহায় ও বিপন্নদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সীমিত আকারে প্রচলিত ছিল। তবে ব্যাপক শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ লাভ করতে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দাবি করে থাকে। নিম্নে সামাজিক নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলোঃ

১. সামাজিক বিমা (Social Insurance)

সামাজিক *বিমা হলো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান* উৎস। সামাজিক বিমাকে আমরা কয়েকটি ভাগে চিহ্নত করতে পারি।

ক. **চাকরিজীবী বিমা** ঃ প্রতিমাসে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে এ ধরনের বিমা ব্যাবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে চাকুরিকালীন অক্ষমতা, পরিবারের বিশেষ বিপদ, দীর্ঘকালিন অসুস্থতা প্রভৃতি সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে।

খ. **স্ব-প্রণোদিত ব্যক্তি বিমা** ঃ যারা চাকরি না করে আত্মকর্মে নিয়োজিত থাকে তারা বিভিন্ন কারণে আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার সম্মুখীন হন। বিশেষ ভাবে, বিশেষ শর্তাধীনে এ ধরনের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে।

গ. **বেকারত্ব বিমা** ঃ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ নানা কারণে স্থায়ী বা মৌসুমি বেকারত্বের শিকার হয়। তখন বিশেষ ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বেকারত্ব বিমা বিশেষভাবে অবদান রাখে।

ঘ. **স্বাস্থ্য বিমা** ঃ মানুষ নানাবিধ কারণে শারীরিক ও মানসিক ভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে যে আর্থিক সহায়তা কিংবা চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয় তার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

ঙ. **বার্ধক্য ও বৈধব্য বিমা** ঃ বার্ধক্য ও বৈধব্যের কারণে অসংখ্য নারী-পুরুষ দূর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করে। এসব সমস্যাগ্রস্ত লোকদের জন্য উন্নত বিশ্বে বার্ধক্য ও বৈধব্য বিমা চালু রয়েছে।

চ. শিল্প দুর্ঘটনা বিমা ঃ শিল্প কারখানায় কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক যদি দুর্ঘটনার শিকার হন তাহলে তার ক্ষতির ভিত্তিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে এ ধরনের বিমা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. সরকারি সাহায্য ঃ

দরিদ্রতা, বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব , অসুস্থতা , উপার্জনকারীর মৃত্যু, ইত্যাদি কারণে বিপদগ্রস্থ ও অসহায়দের জন্য সরকারি রাজস্ব থেকে যে সহায়তা করা হয় তাকে সরকারি সাহায্য বলে। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়।এ ধরনের সাহায্য সেবা কর্মসূচির মধ্যে চিকিৎসাসেবা , বার্ধক্য সাহায্য, স্থায়ী ও পূর্ণ অক্ষম সাহায্য, নির্ভরশীল শিশু ও পারিবারিক সাহায্য, সাধারণ সাহায্য কর্মসূচি অন্যতম।

৩. স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণঃ স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ কর্মকান্ড। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসাবে উন্নত বিশ্বে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবিল পাস হবার পর সকল মানুষের সকল ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এখন নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকার। ইসলামী সমাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে- রুগীর সেবা করা মানে রহমতের সাগরে ভেসে বেড়ানো। রাষ্ট্র এখানে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকে। ইসলামী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সার্বিক নিরাপত্তা বিধান যেমন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য তেমনি নাগরিকদেরও অধিকার। সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা, নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সাথে নিরাপত্তাও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবেও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পটভূমি

আধুনিক শিল্প সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হল 'সামাজিক নিরাপত্তা'। আধুনিক সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত সামাজিক নিরাপত্তা অতীতে না থাকলেও সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা মানব সমাজে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত ছিল। সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাস সমাজকল্যাণের মতই সুপ্রাচীন। সকল সমাজেই নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য কোন না কোন নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল। আদিম মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলত। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে, আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত।

বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রাক শিল্প যুগে আধুনিক শিল্প সমাজের ন্যায় মানুষের জীবনে সাধারণ ঝুঁকি তেমন ছিলনা। ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা চালানো হত। জীবনের সাধারণ ঝুঁকি কম থাকায় প্রাক শিল্প সমাজে মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলনা। সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যৌথ পরিবারই ছিল সামাজিক নিরাপত্তা'র মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ সামাজিক নিরাপত্তা'র ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের আস্তানা ও আশ্রমে লঙ্গরখানা, ইয়াতীমখানা, সরাইখানা প্রভৃতির মাধ্যমে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্থদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-শিল্প যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় রাজাগণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে জনসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রজাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতেন। এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল সাময়িক এবং বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিত।

শিল্প বিপ্লবের ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে তা সামাজিক নিরাপত্তা'র প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তোলে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ভাঙ্গন , বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা প্রভৃতি দেখা দেয়। এসব সমস্যা মোকাবেলার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সুসংহত ও সুপরিকল্পিত সামাজিক নিরাপত্তা রাষ্টীয় পর্যায়ে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাষ্টীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সূচনা করেন জার্মানীর চ্যান্সেলর বিসমার্ক (Otto Von Bissmark) ১৮৮৩ সালে। ১৮৮০ সালের মধ্যে তিনি সামাজিক বিমা (Social Insuranc) সম্পর্কিত কতিপয় আইন প্রনয়ন করেন। ১৮৮৩ সালে জার্মানীতে প্রথম বাধ্যতামূলক Insurance Act প্রণীত হয়। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি অন্যান্য দেশে গৃহীত হয়।[১৪]

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা'র নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে," From each according to his capacity, to each according to his need," অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাঁদের সামর্থ ও সুযোগ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার কাজের মান বা পরিমাণ যাই হোক না কেন বিনিময়ে রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় জীবিকার সংস্থান করবে।' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আহার, বাসস্থান ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়া বেকার, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু লোকসহ সকল নির্ভরশীল নাগরিকের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও রাষ্ট্র গ্রহণ করে।[১৫]

---

[১৪] *সমাজকল্যাণের ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

[১৫] আবদুল হক তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র ও পরিসীমা অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কেবল দুঃস্থ, অসহায় ও অক্ষম লোকদের নিরাপত্তা বিধানই নয়, আকস্মিক বিপদ থেকে সক্ষম ও সচ্ছল লোকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করাও সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। আজকের বিশ্বে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র যে ধারণা বিদ্যমান এর সাথে মানবতার ধর্ম ইসলাম সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসিকে পরিচয় করিয়েছে। যথার্থ অর্থে মানব ইতিহাসে মহানবী (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রেই 'সামাজিক নিরাপত্তা'র বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এর সুফল নানাভাবে ভোগ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয় 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ধারণা মুসলিমগণের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কালক্রমে মুসলিমগণ 'সামাজিক নিরাপত্তা'র জন্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে হাত বাড়িয়েছে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করতে গিয়ে তারা অসংখ্য সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য তাদেরকে ইসলামের মহান আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয়া যাতে করে তাঁরা ইসলাম ঘোষিত 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ধারণাকে পূর্বের ন্যায় বাস্তবায়ন করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাতে পারেন। পাশাপাশি তথাকথিত উন্নতবিশ্বে যারা নিজেদেরকে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ব্যবস্থার জন্মদাতা বলে দাবি করে তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া যে, তাদের এ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার কয়েকশ বছর পূর্বেই ইসলাম এ ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং ইসলামের সোনালী যুগে মহান খলীফাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাষ্ট্রে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ন্যায় অর্থনীতিতেও ইসলাম রয়েছে যথার্থ ভূমিকা। ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে যাকাত। যাকে আধুনিক কল্যাণ ভাষায় ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান (Social Security System of Islam) বলা বলতে দ্বিধা নেই, পাশ্চাত্যে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান তথা সমাজ কল্যাণ নীতির ফলপ্রসূ ও করে যথার্থ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নমুনা (Model) বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে, যখন এ পৃথিবী সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার নাম-নিশানাও ছিল না। যদি বৃটেনের রাণী এলিজাবেথের আমলের। (Law-1601) কে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দৃষ্টান্ত হিসেবেও ধরা হয় তাহলে এরও এক হাজার পূর্বে; আর যদি ১৮৮৩ সালে জার্মাণিতে 'বিসমার্ক' সম্মেলনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য Accidental Insurance Act কে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া হয় তাহলে প্রায় ১২৫০ বছর আগেই যাকাত নামক সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম সফলতার সাথে রাষ্ট্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তন করেছিল। এ প্রসংগে খালিদ বলেন, "যা হোক ৬২২ খৃস্টাব্দ ছিল কল্যাণরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক মাইলফলক। এ বছর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা ছিল এলিজাবেথিয়ান দরিদ্র আইন ১৬০১ অনেক আগের।"[১৬]

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন সেদিন থেকেই মানুষ রিযকের তালাশে কঠোর কাজ করা শুরু করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী যমিনের মধ্যে লুকায়িত রেখেছেন যেগুলো ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা খবর দিচ্ছেন, "তোমার এটা রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত ও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্ত ও হবে না রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।"[১৭]

এ আয়াতে রয়েছে মানুষের খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও বস্ত্রের কথা যা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ছিল হিসাবে বিবেচিত। এগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পার্থিব জীবনের উত্তম বিষয়াবলী রিযক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যেহেতু তিনি জানেন যে, মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে আল্লাহর নির্দেশাবলী নিষেধাবলী অবগত হতে পারবে না সেহেতু তিনি মানবতার জন্য সুসংবাদদানকারী এবং ভীতিপ্রদর্শন রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,"এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার মধ্যে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।"[১৮]

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষকে হালাল-হারাম শিক্ষা দিয়েছেন। মানব সমাজ তাঁদের মাধ্যমেই তাদের জন্য কোনটা উপকারী এবং কোনটা ক্ষতিকর তা জানতে পেরেছে। নবী-রাসূলগণ মানবতাকে এ কথাও শিক্ষা দিয়েছেন যে, সমস্ত বিশ্ব-জগত আল্লাহর। তিনি এর একচ্ছত্র মালিক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কুর'আনে এসেছে, "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।"[১৯]

---

১৬ Mohammad Khalid, *Welfare state-A case study of Pakistan*, p. 07

১৭ আল-কুর'আন, ২০ ঃ ১১৮-১১৯

১৮ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ আল-কুর'আন, ৩৫ ঃ ২৪

১৯ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا আল-কুর'আন, ১৯ : ৯৩-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বোঝা যাচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহর অনুগত, সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর, সকল মানুষ তাঁর গোলাম এবং বিধি-বিধান দেয়ার একমাত্র অধিকার তিনিই সংরক্ষণ করেন। সুতরাং আমাদের বোঝা উচিত যে, আমাদের সুস্থতা আমাদের ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমত বা অনুগ্রহ। আর মানুষের স্বভাব যেমনটি আল্লাহ্ বলছেন, "বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজকে অভাব মুক্ত মনে করে।"[২০]

প্রত্যেক মুসলিমের জানা উচিত যে, সে এ সকল নি'আমতরাজীর তত্ত্বাবধায়ক। সে কোনটির মালিক নয়। সকল কিছুর মালিক আল্লাহ্। কুর'আন ঘোষণা করছে, "এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।"[২১]

এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সম্পদ ও সব জিনিসের মালিক আল্লাহ্। মানুষের দায়িত্ব হল আল্লাহর দেয়া মাল থেকে খরচ করে সামাজিক দায়িত্ব পালন। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কোথা থেকে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে।

যিনি মুসলিমগণের জন্য কাজ করেন তিনি 'আমিল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[২২] আর রাসূলুল্লাহ্(স.) হযরত আবু যর (রা.) কে বলেছেন যখন তিনি, ইমারত (শাসনভার) চেয়েছিলেন:

"হে আবূ যর নিশ্চয়ই তুমি দুর্বল ব্যক্তি, আর প্রশাসন একটি আমানত, যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে ধরে রাখতে পারবে না এবং তার দায়-দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করতে পারবে না, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন লজ্জা ও আফসোসের কারণ হবে।"[২৩] অতএব আমল বা কাজ যখন আমানত তখন প্রত্যেক দায়িত্বশীলের উচিত কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া তা আদায় করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ কর না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ কর না।"[২৪]

---

[২১] وأنفقوا ممّا جعلكم مُستخلفين فيه আল-কুর'আন, ৫৭: ০৭

[২২] إنّ خير من استأجرت القويُّ الأمينُ আল-কুর'আন, ২৮ : ২৬

[২৩] يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى و ندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها সহীহ্ মুসলিম, কিতাবু'ইমারাত, হাদীস নং: ১৬

[২৪] يأيُّها الّذين امنوا لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون আল-কুর'আন, ০৮ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত রাগ করতেন যদি কোন কর্মচারি (আমিল) স্বীয় কল্যাণের জন্য তার পদ ও পদবীকে ব্যবহার করত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ইব্নুল-লুতবিয়াকে যাকাত উসূল করার জন্য পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন, "এটা হল আপনাদের মাল আর এটা হল আমাকে দেয়া হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার বাবা-মার ঘরে বসে থাক না, অতঃপর দেখ যে, কেউ তোমাকে হাদিয়া দেয় কিনা' এ কথা বলে তিনি মিম্বারে দাড়ালেন-আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করে বললেন-'আমি যে আমিলকে যাকাত উত্তোলনের জন্য পাঠাই তারপর সে এসে বলে এটা আমার এবং এটা আপনাদের সে কেন তার বাবা অথবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখে না যে তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তোমাদের যে কেহ যাকাত সাদাকা থেকে যদি কোন কিছু গ্রহণ করে সে কিয়ামতের দিন তা তার ঘাড়ে বহন করে উপস্থিত হবেন। সেটা যদি উট হয় তাহলে সে চি চি করবে, গরু হলে হাম্বা হাম্বা করবে আর ছাগল হলে ভ্যা ভ্যা করবে। অতঃপর তিনি দু'বার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছাতে পেরেছি।"[২৫]

এ কারণে হযরত 'উমর (রা.) তাঁর অধীনস্থ 'আমিলদের খোঁজ খবর নিতেন। কিন্তু তিনি যখন সিরিয়া গেলেন এবং সেখানকার লোকদের বললেন তোমরা আমার নিকট তোমাদের দরিদ্র লোকদের নাম লিখে দাও। তারা তাদের নাম লিখলেন। তালিকায় দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রথম নামটি ছিল তাদের ওয়ালী বা শাসক সাঈদ ইব্ন 'আমের (রা.) এর। বিষয়টি হযরত 'উমর (রা.)-কে বেশ চিন্তিত করল। তিনি তাঁর গভর্নরের এ তাক্ওয়া ও দুনিয়া বিমুখতা দেখে কেঁদে ফেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য একহাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেন যেন তিনি এ অর্থ দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেন এবং শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারেন।[২৬]

ড. ইসমাঈল বাদাবী বলেন প্রত্যেকটি কাজের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ[২৭]

প্রথম উদ্দেশ্য : শারিরীক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য জরুরি রিযক উপার্জন করা তো ফরযে আইন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ঋণ পরিশোধ করার জন্য কাজ করা এটা জরুরি বিষয় এবং অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের অন্যতম।

---

[২৫] هذا مالكم و هذه هدية اهديت الي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك و امك فتنظر ايهدى اليك ام لا ؟ ثم قام على المنبر فحمد الله و اثنى عليه وقال : ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم و هذا أهدى لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا؟ و الذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على عاتقه بعير اله رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم قال : اللهم هل بلغت مر تين-
সহীহ বুখারী, কিতাবুল আইমান, বাব নং - ৩

[২৬] উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আস-সাইয়্যেদ আস-সাইয়্যেদ সাফতী, *দেরাসাত ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী* (ঢাকা:২০০৬), পৃ. ১১

[২৭] মুহাম্মদ আস-সাইয়্যেদ আস-সাইয়্যেদ সাফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় উদ্দেশ্য : পরিবার-পরিজন এবং যাদের জন্য খরচ করা কর্তব্য তাদের জন্য ব্যয় করার ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার জন্য কাজ করা। আল্লাহ্ বলেন, "জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।"[২৮]

ইসলামী শারী'আতে সকল পবিত্র, উপকারী ও কল্যাণমূলক কাজ বৈধ। এছাড়া সকল ক্ষতিকারক, অপবিত্র ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ অবৈধ। সুতরাং যে সব কাজের ভিত্তি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সে সব কাজ, হীন ও নিকৃষ্ট কাজ, যেমন-যাদু করা, মদ, কুকুর ও শুকর এর ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সবই হারাম। বিশেষ করে মদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা মদ, মদ পানকারী, মদ পরিবেশনকারী, মদের ক্রেতা-বিক্রেতা, সরবরাহকারী এবং যার জন্য রস বের করা হয়, যে বহন করে এবং যার জন্য বহন করা হয়, এবং এর মূল্য খায় এদের সবাইকে লা'নত করেছেন।"[২৯]

রাষ্ট্র যন্ত্রের পদস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারি (শ্রমিক) যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে পদচ্যুত করতে হবে। হযরত উমর (রা.) রাষ্ট্রের সা'দ (রা.) কে সরিয়ে তাঁর স্থলে অন্য আরেকজনকে নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া হযরত 'উমর (রা.) 'উতবাহ ইবন গাযওয়ান (রা.) কে ও সরিয়ে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা তিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি আমাদের মালিক সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক, আমাদের সম্পদের মালিক, তিনি শারী'আতের প্রবর্তক, তাঁর শারী'আত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে সমধিক অবহিত। "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।"[৩০]

এ কারণে আমাদের বোঝা উচিত যে, সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র, সকল মানুষ আল্লাহ্র বান্দা এবং মানুষের জন্য দেয়া শার'ঈ বিধি-বিধান আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত। তবে সম্পদকে তিনি ব্যক্তি সমষ্টি ও কখনও অন্য ব্যবস্থার অধীন করে দিয়েছেন। আমাদেরকে আমাদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তাহতে ব্যয় কর।"[৩১] মুসলিম জামা'আত (উম্মাহ) তাঁদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে

---

[২৮] وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف আল-কুর'আন, ০২: ২৩৩

[২৯] لعن الله الخمر و شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আশরিবা, বাব নং-২, হাদীস নং-৩৬৭৪

[৩০] ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير আল-কুর'আন, ৬৭ : ১৪

[৩১] وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه আল-কুর'আন, ৫৭:৪ ০৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ কর না।"[৩১]

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের তৈরি করা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রথমে চমক নিয়ে আসলেও পরিণতিতে তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা জাগতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকায় আগমন করলেও পরবর্তীতে তা নিজেই রোগী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। মানুষ মানব রচিত এসব বিধি-বিধানের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। তাদের সমস্যা না কমে বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐসব নিয়ম-নীতি তাদেরকে অলস, বেকার ও অক্ষম বানিয়েছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র নায়করা 'সামাজিক নিরাপত্তা' নামক নতুন শ্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছে।

ইসলাম পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ কোনটাই নয়। ইসলাম হল বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত দ্বীন। ইসলামের মতে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্‌র মানুষ হল তার তত্ত্বাবধায়ক।[৩৩]

১. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি থেকে মালিকানা রক্ষা করা।[৩৪]

২. ইসলামে সম্পদের মালিকানার কোন ঊর্ধ্ব-সীমা নেই। সুতরাং যে কেউ অঢেল সম্পদের মালিক হতে পারবে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে এত সম্পদের মালিক হয়েছেন তাহলে রাষ্ট্র প্রধানের কিছু সম্পদ নিয়ে নেয়ার অনুমতি রয়েছে যেমনটি হযরত 'উমর (রা.) করেছেন হযরত খালিদ, হযরত 'আমর, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর মালের ব্যাপারে।

৩. ইসলাম ধনীদের উপর ফকীর, মিসকীন, মুখাপেক্ষী ও অক্ষম লোকদের জন্য তাদের প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করাকে অপরিহার্য করেছে। চারটি জিনিসের মাধ্যমে তা হয়ে থাকে:

(ক) খাদ্য : তা প্রত্যেক ক্ষুধার্তের হক। সামর্থ্য অনুসারে ধনী মুসলিম ফকীর বা মিসকীনকে ক্ষুধা নিবারণ করার ব্যবস্থা করবে।

(খ) পানি : পৃথিবীর কোন কোন স্থানে পানি খাদ্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে মরু অঞ্চলে। মরু অঞ্চল ছাড়াও বিশ্বের অনেক স্থানে মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না ফলে দূষিত পানি পান করে তারা নানা

---

[৩১] আল-কুর'আন, ০৪ : ০৫ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মারা যাচ্ছে। তাই যারা পানি বা বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না স্বচ্ছল মুসলিমগণ তাদের পানির ব্যবস্থা করবে।

(গ) পোশাক : অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের সতর ঢাকা এবং তাদের নারীদের হিযাবের জন্য পোশাকের সংস্থান করা মুসলিম সমাজের ধনী লোকদের দায়িত্ব। তবে খুব মূল্যবান পোশাক হওয়া শর্ত নয়, শর্ত হল সতর আবৃত করার মত পোশাকের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) বাসস্থান : রোদ বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বনী-আদমের বাসযোগ্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। তা কুড়ে ঘরও হতে পারে, তাবুও হতে পারে, ইট বা পাথরের তৈরি বিল্ডিং অথবা কাঠের তৈরি বাড়ীও হতে পারে।

মূলকথা হল, যে ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে সে যেন বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, সতর (লজ্জাস্থান) ঢাকার জন্য পোশাক এবং বসবাসের জন্য একটি বাসস্থান পায়, সে ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজকে করতে হবে। কুর'আনে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "তোমার জন্য এটা রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্তও হবে না এবং রোদ্রক্লিষ্টও হবে না।"[৩৫]

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) কে জান্নাতে এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। এ আয়াত ইংগিত করে যে, এ বিষয়গুলো মানুষের জন্য খুবই জরুরি। তাছাড়া খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্তান ব্যতীত মানুষ কিভাবে বাঁচবে। এ চারটি হল মৌলিক প্রয়োজন। যুগের উন্নতির সাথে সাথে মৌলিক প্রয়োজনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. সম্পদের মালিকদের উপর যাকাতের হক রয়েছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, তার কাছ থেকে জোর করে তার উপর নির্ধারিত যাকাত এবং তার বাকী মালের একটি অংশগ্রহণ করা যাবে।

৫. 'মুদারাবা' ও 'শিরকাতে ইসলামিয়া' পন্থায় মাল বাড়ানোর চেষ্টা করার মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য লোকেরা ব্যবসায়িক কাজ-কর্ম, কায়িক শ্রম ও বাজারে গমনাগমনের সুযোগ পায়।

সুদ, প্রতারণা ও মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাল গুদামজাত করা নিষিদ্ধ তথা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[৩৬]

---

[৩৫] وأنك لا تظمأ فيها ولا تعشى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى আল-কুর'আন, ২০ : ১১৮-১১৯

[৩৬] وأحل الله البيع وحرم الربا আল-কুর'আন, ০২ : ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল-মীরাস। মীরাস হল আল্লাহর বিধান এটা পূর্ব বা পশ্চিম থেকে আমদানি করা কোন বিষয় নয়। ইসলামে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তানরা ও নিকটাত্মীয়রা তার সম্পদের মালিক হয়।

জীবিকার নিরাপত্তা

সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনিই এ বিশ্বলোককে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বের করে এনে অস্তিত্বসম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীর প্রয়োজন পূরণ ও চাহিদা পরিবেশনের মাধ্যমে লালন পালন করে ক্রমশ বৃদ্ধি দান করে এ পৃথিবী এবং এ অন্তহীন বস্তু, জীব ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এসব জীব ও প্রাণীর বেঁচে থাকা ও প্রবৃদ্ধির জীবিকার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর যেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হোক, লক্ষ্য করা যাবে, প্রত্যেকটি জীবজন্তু ও প্রাণীই যাতে করে তার প্রয়োজনীয় জীবিকা রীতিমত পেতে পারে এবং কোন একটি জীব বা প্রাণী যাতে এ জীবিকা থেকে বঞ্চিত না থাকে, সমগ্র জগতে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা শুরু থেকেই বিরাজমান।

প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্যভাবে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যছাড়া প্রাণীর বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব নয় খাদ্যই প্রাণীর সকল শক্তির উৎস। উদ্ভিদ জগতে যে খাদ্য গ্রহণ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণীর সে খাদ্য গ্রহণ ইচ্ছামূলক ও শ্রমসাধ্য। আল্লাহ্ তা'আলাই যে সমগ্র প্রাণী জগতের রিযক বা খাদ্যের ব্যবস্থা করেন সে কথাই ঘোষিত হয়েছে পবিত্র কুর'আনে। ইরশাদ হচ্ছে, "ভূ-পৃষ্টে সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"[৩৭]

মানবকুলের জীবিকার নিরাপত্তা

এ পৃথিবীতে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। এ মানুষের জীবিকা ও জীবনোপকরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহর কতগুলো ঘোষণা কুর'আন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলঃ

"আমিতো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৩৮]

উপরোক্ত আয়াতে 'আদম সন্তান' বলতে সব মানুষই উদ্দেশ্য। অতএব নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দুনিয়ার সর্বত্র অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা, উত্তম খাদ্য ও জীবনোপকরণ পাওয়ার এবং অন্যান্য

---

[৩৭] وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين আল-কুর'আন, ১১ : ৬

[৩৮] ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا আল-কুর'আন, ১৭ : ৭০

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের সুযোগ থাকতে হবে। বস্তুত এ হচ্ছে মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহের অংশিদার সমানভাবে সব মানুষ।

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং রাত ও দিনকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছে তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।"[৩৯] "আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি।"[৪০] "তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিন সময়ের মধ্যে তিনি সকলের জন্য সমভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।"[৪১] "আমিই পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টণ করি।"[৪২]

এ আয়াত সমূহের মূল কথা হল, এ বিশ্ব প্রকৃতির অস্তিত্ব দান ও বিশেষ নিয়মের অধীন নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং বিশেষভাবে মানুষের রিযক, জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহ ও পরিবেশনের লক্ষ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। কেননা সৃষ্টিকর্তা তাঁর সেরা সৃষ্টি এ মানুষকে জীবন দিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছেন একান্ত দয়াস্বরূপ। জীবন দেবেন, কিন্তু জীবিকা দেবেন না-তা মহান সৃষ্টি কর্তা সম্পর্কে চিন্তা ও করা যায় না। আল্লাহর এ জীবিকা দান ব্যবস্থা কিছু সংখ্যক সৃষ্টির জন্য নয়, সমগ্র জীব এবং প্রাণীকূলের জন্য যেমন ঠিক, তেমনি জীবিকার ব্যবস্থা এবং তার নিশ্চয়তা কিছু সংখ্যক বা একশ্রেণীর মানুষের জন্য নয়, নির্বিশেষে সকল কালের সকল দেশের সব মানুষের জন্যই এ ব্যবস্থা।

---

[৩৯] আল-কুর'আন, ১৪: ৩২-৩৪

[৪০] ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون আল-কুর'আন, ৭ : ১০

[৪১] وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين আল-কুর'আন, ৪১ : ৯-১০

[৪২] نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا আল-কুর'আন, ৪৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলামের কল্যাণকর ভূমিকার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন: "হে মানুষ! তোমরা বল আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ নেই, এ আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহলেই তোমরা কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে।"[৪৩]

মানুষের জীবনে প্রকৃত কল্যাণের পথে দুটি প্রধান বাধা। একটি ভয়-ভীতি, জীবন-রক্ষায় আশংকা বোধ এবং অপরটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন। ইসলাম প্রচারের প্রথম অধ্যায়েই মহানবী (স.) মানুষকে এক আল্লাহর বন্দেহী কবুলের আহবান জানানো প্রসঙ্গেই উপরিউক্ত দুটি বাধা বা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তিনি লোকদের এ কালাম শুনিয়েছিলেন, "অতএব তারা ইবাদাত করুক এ ঘরের মালিকের যিনি ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[৪৪]

আয়াতটি মক্কার কুরাইশদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ। এটা তার বিশেষ প্রেক্ষিত। কুর'আনের প্রায় সব আয়াতেই তা রয়েছে। কিন্তু কুর'আনের কোন কথাই বিশেষ প্রেক্ষিতে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তার একটা স্থায়ী, সাধারণ ও মানবিক মূল্য রয়েছে। এ দৃষ্টিতে উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে, যে আল্লাহ মানুষকে ক্ষুধায় অন্ন যুগিয়েছেন এবং সর্বপ্রকারের ভয়-ভীতি আশংকা থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন, তাঁর কেবল আল্লাহরই বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল করা উচিত। সেই সাথে তাৎপর্যও অবশ্যই স্বীকৃতব্য যে, মানুষ যদি ক্ষুধার অন্ন ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে জীবনের নিরাপত্তা লাভ করতে চায়, তাহলে সেজন্য তাকে কেবল এক আল্লাহরই বন্দেগী কবুল করতে হবে। কেননা আল্লাহই রিযকের মালিক। রিযিকদানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই রয়েছে। মানুষকে ভয়-ভীতি থেকে কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন। উপরন্তু আল্লাহ মানুষের জন্য এমন পূর্ণাঙ্গ বিধান নাযিল করেছেন যা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও তার ভিত্তিতে সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি গড়ে তোলা হলে মানুষ ক্ষুধায় অন্ন পাওয়ার ও জীবনের নিরাপত্তা লাভের সুযোগ পেতে পারে। বস্তুত মানুষকে এ দু'টি বিষয়ে নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে কেবল আল্লাহর বিধান পূর্ণাঙ্গ দীন-ইসলাম। অন্য কোন ধর্ম বা মানব রচিত সমাজ বিধানই মানুষকে এ নিরাপত্তা দানের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

ইসলামী বিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈমানের সঙ্গে বাস্তব কাজের সংগতি স্থাপন করার তীব্র তাকীদ। সমাজে স্বাভাবিকভাবেই এমন অসহায় বালক-বালিকা থাকতে পারে, যাদের প্রয়োজন পূরণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনকারী পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তারা চরমভাবে অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে, থাকতে পারে অসংখ্য গরীব-মিসকীন ফকীর। এরূপ অবস্থায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খোরাক-পোশাক যোগানোর

---

[৪৩] يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৯২

[৪৪] فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف আল-কুর'আন, ১০৬ : ৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব সে সমাজকেই বহন করতে হবে, যে সমাজে তারা বসবাস করছে। সে সমাজ যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে এ অসহায়দের দুনিয়ায় বেচে থাকার আর কোন উপায়ই থাকে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাধ্যমে যে বিধান নাযিল করেছেন, তাতে এ লোকদের জন্য সমাজের লোকদেরকেই দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত যে সমাজ সে দায়িত্ব পালন করে তাই আল্লাহর এবং তাঁর নাযিল করা দ্বীনের প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবি করতে পারে। অন্য কথায়, আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমানদার হতে হলে সমাজের এ অসহায় লোকদের অন্ন যোগানোর ও তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দানের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে নতুবা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি তাদের ঈমান নেই বলেই প্রমাণিত হবে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম (অথবা বিচারের দিন) কে অসত্য মনে করে, তার বিষয়ে কি তুমি বিবেচনা করেছ? সেতো সে-ই যে ব্যক্তি ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়-প্রত্যাখ্যান করে এবং মিসকীনকে খাদ্য (নিজে তো দেয়ই না), অন্য লোকদেরও তা দেয়ার জন্য উৎসাহিত করে না।"[৪৫]

দ্বীন ইসলামের প্রতি কিংবা পরকালের প্রতি ঈমানদার হতে হলে সমাজের ইয়াতীম মিসকীন প্রভৃতি অসহায় লোকদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে। ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে ব্যক্তির সামর্থ্যানুযায়ী এবং সমষ্টিগতভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগ-আয়োজনের মাধ্যমে সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলতে হবে, যার ফলে অসহায় দরিদ্র লোকেরা জীবন-জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে।

উপরিউক্ত আয়াতাংশ একটি ধনশালী, অহংকারী ও মানবতা বিবর্জিত সমাজের এবং তাতে ইয়াতীম-মিসকীন প্রভৃতি অসহায় লোকদের চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা-অপমানের করুণ চিত্র তুলে ধরছে। এরূপ সমাজ কখনই দ্বীন ইসলামের ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সমাজ হতে পারে না, মুখে ঈমানদারীর যত বড় দাবিই করা হোক না কেন। কেননা আল্লাহর নিকট ঈমানদারীর মৌখিক দাবির কোন মূল্য নেই। ইসলাম নিছক বিশ্বাসের ব্যাপারও নয়। ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে সাথে বাস্তব কাজে তার প্রতিফলন ঈমানের সত্যতার জন্য অপরিহার্য শর্ত। অতএব যে লোক আল্লাহ, পরকাল ও দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমানদার, তাতে সমাজের এ অসহায় লোকদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। তবেই তার ঈমানের যথার্থতা ও প্রমাণিত ও স্বীকৃত হবে।

কিয়ামতের দিন যেসব লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের একটি অপরাধ থাকবে আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার। আর দ্বিতীয় অপরাধ থাকবে ইয়াতীম-মিসকীনকে খাবার না দেয়ার, খাবার দিতে অন্যদের উৎসাহিত না করার। কুর'আন মাজীদেই বলা হয়েছে, "(নির্দেশ দেয়া হবে) ধর লোকটিকে, তার গলায় ফাঁস লাগাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তার উপর তাকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে

---

[৪৫] ارايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين আল-কুর'আন, ১০৭ : ১-৩

Dhaka University Institutional Repository

ফেল। সে লোকটি না আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল, না মিসকীনকে খাবার দিতে লোকদের উৎসাহ দিত।"[৪৬]

অপর একটি আয়াতে জাহান্নামীদের অপরাধের স্বীকারোক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে, "আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলাম না এবং মিসকীনকে খাবারও খাওয়াতাম না।"[৪৭]

যেসব অপরাধের দরুণ মানুষ কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে, মিসকীন-গরীব-ফকীর লোকদের খাবার না খাওয়ানো এবং খাবার দেয়ার জন্য অন্য লোকদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ না করা তার মধ্যে অন্যতম। অভুক্ত লোকদের খাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যে সাধারণভাবে সমাজের সব লোকের তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে লক্ষ্য করে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তুমিও তো ইয়াতীম ছিলে। আল্লাহ্ তোমার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলেই তোমার পক্ষে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়েছে। অতএব সমাজের সব ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তোমার রয়েছে।

"হে নবী! তোমাকে কি তোমার আল্লাহ্ একজন ইয়াতীমরূপে পান নি? অতঃপর তিনিই তো তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমাকে কি তিনি পথহারা পান নি? পরে তিনিই তো তোমাকে জীবন বিধান ও পথের সন্ধান দান করেছেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায় পরে তিনিই তোমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করেছেন। অতএব ইয়াতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। ভিক্ষাপ্রার্থীকে তুমি রূঢ়তা দেখিয়ে তাড়াবে না। বরং আল্লাহর দেয়া নি'আমতের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাবে।"[৪৮]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন ইয়াতীম পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তি। আল্লাহই তাঁকে পিতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অতএব সমাজের সব ইয়াতীম, অসহায় লোকদের জন্য আশ্রয়, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন বিশ্ব মানব মুক্তির সন্ধানী, নিপীড়িত, নিগৃহীত ও জ্ঞানান্ধ মানুষের প্রদর্শন প্রয়াসী। আল্লাহ তাঁকে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করে ও তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে দীন ইসলাম নাযিল করে তাঁকে জীবন পথ ও দায়িত্ব জানিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব

---

৪৬ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه ذوه فغلوه ولا يحض على طعام المسكين আল-কুর'আন, ৬৯ : ৩০-৩৪

৪৭ ولم نك نطعم المسكين قالوا لم نك من المصلين আল-কুর'আন, ৭৪ : ৪৩-৪৪

৪৮ وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فاوى আল-কুর'আন, ৯৩ ৬-১১

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই দায়িত্ব হচ্ছে দুনিয়ার আদর্শহীন মানুষকে আদর্শবাদী বানানো, পথহারা ও লক্ষ্যহীন মানুষকে পথের সন্ধান দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিযাত্রী বানানো। তিনি ছিলেন পরিবার বহনের দায়িত্বশীল, অথচ দরিদ্রতম ব্যক্তি। আল্লাহই তাঁকে সচ্ছলতা দান করেছিলেন, অন্য লোকদের নিকট ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার লাঞ্ছনা থেকে তিনিই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অতএব তাঁরই (রাসূলের) দায়িত্ব এমন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে না। শুধু তাই নয়, তার এ অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সে একবিন্দু উপেক্ষা বা লাঞ্ছনা ভোগ করতেও বাধ্য হবে না। তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান ও অপমানও করবে না।

শুধু ইয়াতীম ও মিসকীনের কথাই নয়। সমাজে বহু অসহায়, অক্ষম, বৃদ্ধ বা বিধবা স্ত্রীলোক থাকতে পারে, থাকতে পারে বহু ঋণগ্রস্ত ও নিপীড়িত ক্রীতদাস-দাসী। তারা মনিব ও মালিকের হাতে নিরন্তর অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করতে থাকে। সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায়ই তাদের নেই। এরূপ অবস্থায় সমাজের মধ্য থেকে যদি এমন লোক বের হয়ে না আসে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের জীবিকা ও উক্তরূপ অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে, তাহলে তারা কোনদিনই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। ইসলাম যেহেতু মযলুম মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ, সে কারণে ইসলাম শুরু থেকেই এ কাজকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে এবং তাকে ঈমানী দায়িত্বভুক্ত করে ঘোষণা করেছে। ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াতী পর্যায়ে-মক্কাতেই কুর'আন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হয়েছিলঃ

"উভয় স্পষ্ট পথ কি আমি তাকে দেখাই নি? কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জান সে দুর্গম ঘাঁটিপথ কি? তা হচ্ছে দাস-দাসীদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা বা উপবাসের দিনে নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি-মলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, অতঃপর সে ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। এরাই হবে ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার লোক।"[৪৯]

বস্তুত ইসলামী জিহাদের লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার এমন একটি সমাজ গড়া ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে ইয়াতীম-মিসকীন-বিধবা প্রভৃতি অসহায় ব্যক্তি নিজেদের জীবন ও জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, যেখানে দরিদ্র ব্যক্তি কিংবা আকস্মিকভাবে সর্বহারা হয়ে যাওয়া বা অসহায় হয়ে পড়া বাকি নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে কোনরূপ অনিশ্চয়তা বোধে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য হবে না। গোটা সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই সেজন্য দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকবে এবং কার্যত এগিয়ে আসবে।

---

[৪৯] আল-কুর'আন, ৯০ : ১০-১৮

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষ স্বার্থবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। নিজের সুখ-সুবিধা হতে দেখলে মানুষ খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তখন সে হয়ত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ যখন পরীক্ষাস্বরূপ কারোর ধন-সম্পদকে পরিমিত করে দেন, তখন সে ফরিয়াদ করে উঠে। এমনকি 'আল্লাহ তাকে অপমান করেছেন বলতে ও দ্বিধা বোধ করে না। এ হীন মানসিকতা আল্লাহর পছন্দ হতে পারে না। তাই তিনি এ মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন,

"না, কখনই নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে, (তোমাদের মানসিকতা এতই হীন ও সংকীর্ণ যে) তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর না এবং গরীব-মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, তোমরা লোকদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পত্তি বেমালুম হযরম করে ফেল। আর ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা দিশে হারিয়ে ফেল।"[৫০]

এ আয়াতে সমাজের চিত্র অংকিত হয়েছে, আধুনিক পরিভাষায় বললে তা হচ্ছে অর্থ লোলুপ পুজিবাদীদের সমাজ। পুঁজিবাদীরা ধন-সম্পদের পূজারী। যে কোন উপায়ে হোক, ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নেয়া এবং নিজেদের সঞ্চিত সম্পদে কোন কারণেও এক বিন্দু কমতি আসতে না দেয়ার জন্য তারা সংকিত হয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

এ মানসিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটে ইয়াতীম বালক-বালিকাদের প্রতি উপেক্ষো ও অসম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। অথচ তারাও মানুষ, মানুষের সন্তান। সবার মত সুখ স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও রয়েছে। কিন্তু তারা পিতৃহারা হয়েছে বলে তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হচ্ছি।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটে সমাজের অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র-পীড়িত লোকদের প্রয়োজন পূরণে চরম অনীহা প্রদর্শনে, তাদের খাবার যোগানোর ব্যাপারে কোনরূপ দায়িত্বানুভূতি না থাকার কারণে। অথচ তারাও সমাজের মানুষ। তাদেরও, পেট ভরে খাওয়ার অধিকার রয়েছে আমদেরই মত। তাদের অভাব গ্রস্ত হবার জন্য কেবল তারাই দায়ী নয়; সেজন্য বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। হয়তো তারাও একদিন সচ্ছল ছিল। কিন্ত পুঁজিপতিদের শোষণের ফলে তারা সর্বহারা হয়ে পড়েছে। অথবা প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনের ক্ষমতা রাখে না বলেই তাদের এ দারিদ্র্য। কিংবা তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না শুধু এ কারণে যে, মালিকরা তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য দিচ্ছে না। তাদের দ্বারা পুরোপুরি কাজ করিয়ে নিচ্ছ, অথচ তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ মজুরী দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে কিংবা এও হতে পারে যে, শ্রম করার মত শক্তি ও দৈহিক বল তাদের নেই। এসব অবস্থার মধ্যেই তাদেরও তাদের উপর নির্ভরশীলদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বতো গোটা সমাজের। কেননা তারাও সমাজের

---

[৫০] আল-কুর'আন, ৮৯ : ১৭-২০

Dhaka University Institutional Repository

অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয় যে, তাদের পিতা-মাতা হয়তো অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সমাজের লোকেরা তাদের অজ্ঞাতসারে কিংবা তাদের জ্ঞান না হওয়ার সুযোগে তাদের উত্তরাধিকার বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত সহায়-সম্পত্তি অপহরণ করে নিয়েছে। ফলে তারা এখন দরিদ্র-সর্বহারা হয়ে পড়েছে। এজন্য তো সমাজই দায়ী।

ইসলামী মতে অসহায় লোকদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা সমাজের দায়িত্ব। তারা যাতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য না হয়, সেজন্য কোন না কোন ব্যবস্থা বা সংস্থা গড়ে তোলাও সমাজেরই কর্তব্য। কিন্তু না আমরা নিজেরা খাবার দিচ্ছি, আর না তা দেয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা বা সংস্থা গড়ে তুলছি। তা না করা পর্যন্ত আমরা তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন থেকে কখনই মুক্তি পেতে পারি না।"[৫১]

---

[৫১] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্র ও পরিসীমা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। আল্লাহ্ পাক মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেই ছেড়ে দেননি। মানুষ কিভাবে পৃথিবীতে ভাল ভাবে শান্তিতে বসবাস করবে তারও পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। এজন্য তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ মানুষকে সত্যের পথে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশে। ইসলাম ধর্মকে তিনি মানব জাতির জন্য কল্যাণকর রূপে নির্বাচিত করেছেন। মানবজাতির সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামে অনেকগুলো ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে এর ক্ষেত্র ও পরিসীমাও নির্ধারণ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ঃ

যাকাত

ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, সে যেন রুজীর অন্বেষণে কাজ করে ও চেষ্টা চালায়। যাতে সে নিজে এবং নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সে আল্লাহর পথে কিছু খরচও করবে। যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে পারে না এবং তার নিকট সঞ্চিত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পদও নেই যা দিয়ে সে নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তার ভরণ-পোষণ এবং সচ্ছলতার দায়িত্ব আত্মীয়দের উপর। তাকে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার নীচুতা থেকে রক্ষা করা তাদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু প্রত্যেক গরীব ও অভাবগ্রস্তের এমন সচ্ছল ও বিত্তবান আত্মীয় থাকে না, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। এ অবস্থায় সে গরীব ও অক্ষম মানুষ কি করবে যার ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব নেয়ার মত কোন নিকটাত্মীয় নেই? অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম মানুষ যেমন ইয়াতীম, শিশু, বিধবা মহিলা, অত্যন্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কি করবে? আর তারাই বা কি করবে যাদের শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের কোন মাধ্যম পায় না? এ ছাড়া সে সকল লোকের কি হবে যারা কাজ করে কিন্তু সে কাজের মাধ্যমে এত আয় করতে পারে না, যা দিয়ে তার পরিবারের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হতে পারে? এ সকল লোককে কি দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও অভাবের মধ্যে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে? আর সমাজ তামাশা দেখবে? অথচ সে সমাজে যথেষ্ট সম্পদশালী বর্তমান রয়েছে। তারা কি তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত রাখবে?

ইসলাম সমাজের এ ধরনের লোকদেরকে ভুলে যায়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য বিত্তবানদের সম্পদে একটি নির্ধারিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ পরিমাণ আদায় ফরযের মর্যাদা রাখে। একেই বলা হয় যাকাত। যাকাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গরীব-মিসকীনদের অভাবকে খতম করা। যাকাতের হকদারেদের মধ্যে ফকীর-মিসকীনরাই তালিকার প্রথমে রয়েছে। বরং কিছু স্থানে তো মহানবী (স.) যাকাত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণকারীদের তালিকা বর্ণনাকালে ফকীর মিসকীনদেরকেই শুধু দিতে বলেছেন। যেমন হযরত মু'আয (রা.) কে ইয়ামান প্রেরণকালে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীব-মিসকীনদেরকে তা দেবে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীদের মত হল যে, গরীব ও ফকীর ছাড়া যাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোন স্থান নেই।

যাকাত শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয় ঃ যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়।' অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে অর্থ-সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব 'যাকাত' হচ্ছে 'বরকত' পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা।[৫২]

'লিসানুল আরব'গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ : পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। এসব কয়টি অর্থই কুরআ'ন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। ওয়াহেদী প্রমুখ বলেছেন, বাহ্যত এর মৌলিক অর্থ হচ্ছে আধিক্য ও প্রবৃদ্ধি। আরবীতে বলা হয় কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যে জিনিসই বৃদ্ধি পায়, তাই 'যাকাত' হয়। কৃষিফসল ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া তখনই সম্ভব যখন তা আবর্জনা মুক্ত হয়। তাই 'যাকাত' শব্দিটিতে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা বিদ্যমান। ব্যক্তির গুণ বর্ণনায় 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হলে তা হবে সুস্থতা-সুসংবদ্ধতা অর্থে। তখন ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণের আধিক্য হওয়া বোঝাবে। যেমন বলা হয়, অর্থাৎ পবিত্র জাতির মধ্যে চরম মাত্রার কল্যাণসম্পন্ন ব্যক্তি।[৫৩]

বিভিন্ন মালের যাকাত

যাকাতের উৎস দুর্বল বা সংকীর্ণ নয় বরং তা বিশাল এবং প্রশস্ত। নগদ অর্থ, ব্যাবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু-পাখি ছাড়াও কৃষি পণ্যের যাকাত যেমন তরকারী, ফল, শাক প্রভৃতির উপর দশমাংশ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী হল, "যে জমি আকাশ এবং ঝর্ণার (আল্লাহর রহমতের) পানিতে সিক্ত হয় তার উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ এবং যে জমিতে কুপ অথবা নদী প্রভৃতির মাধ্যমে সেচ দেয়া হয় তার উৎপাদনের বিশ ভাগে এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।"[৫৪]

বর্তমান যুগে ভবন ও ফ্যাক্টরীকে কৃষি জমির সাথে কিয়াস করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, মধুর উপরও মোট উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং অন্যান্য প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন রেশম গুটি ও দুধ দানকারী গাভী এবং মহিষ প্রভৃতিকে এর উপর কিয়াস করতে হবে। কিয়াস সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট সে শরী'আতের মূল বিষয়ের একটি, যা আল্লাহ তা'আলা হক ও ইনসাফের সাথে

---

৫২ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ, কুতুবখানা হোসায়নিয়া, ১৯৯৬), পৃ. ৩৯৬

৫৩ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত* (বয়রূত: লেবাবন, আর-রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০ ইং), খ.১, পৃ. ৩৭

৫৪ فيما سقت السماء و العيون او كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৫৫, হাদীস নং ১৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

নাযিল করেছেন। এ জন্য যেভাবে দু'টি ভিন্ন বস্তুকে যেমন এক বলা যায় না তেমনি দু'টি একই ধরণের বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও করা যায় না। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের মালের উপর প্রত্যেক নিসাবধারী মুসলিমগনের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ফরয হয়। দুধপ্রাপ্তি যোগ্য এবং বংশ বিস্তারের জন্য রক্ষিত প্রাণী যেমন উট, গাভী, বকরী প্রভৃতির উপরও প্রায় একই পরিমাণ যাকাত ফরয হয়ে থাকে। শর্ত হল নিসাব পর্যন্ত পৌঁছতে হবে এবং বছরের বেশির ভাগই বিনা মূল্যে ঘাসপানি খাইয়ে চরান হয় এমন হতে হবে। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র.) চতুস্পদ জন্তুর যাকাত ঐ অবস্থাতেও ওয়াজিব করেছেন যখন তার মালিক সারা বছর খাইয়েছে এবং পানি পান করিয়েছে। কতিপয় সাহাবা এবং তাবেয়ীন ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা এ মতেরই সমর্থক।

খননকৃত পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের উপরও পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। ফকীহদের মতে, খনিজসম্পদও এ নির্দেশের আওতায় আসবে। যদিও এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এক পঞ্চমাংশ যাকাতের মত বন্টন করে দিতে হবে অথবা তাকে ফাই এর মালের মত রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হবে।[৫৫]

বায়তুলমাল

জাহেলি যুগের আরবরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে মালে গনীমত পেত, তার সিংহ ভাগের অধিকারী হতেন খোদ গোত্র সরদার এবং বাকিটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত।

বদর যুদ্ধেই মুসলমানরা সর্বপ্রথম মালে গনীমতের অধিকারী হয়। এ সার্বজনীন সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুসলিমগণকে মৌখিকভাবে কুর'আনের নিম্নোক্ত নির্দেশটি শুনিয়ে দেন।

"হে মুহাম্মদ! লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়।"[৫৬] অতএব "রাসূলুল্লাহ (স.) তা মুসলিমগণের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন।"[৫৭] "বায়তুল মালের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন পর্যন্ত মালে গনীমতের খুমুস গ্রহণ করা হত না। রাসূল (স.) তাঁর বিবেচনা অনুযায়ীই মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন।[৫৮] কিন্তু বদর

---

৫৫ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *মাশকালাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা 'আলাজাহাল ইসলামু* (কায়রো: ওয়াহবা পাবলিশার্স, ২০০৩), পৃ. ৬৪-৬৬

৫৬ يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين আল-কুর'আন, ৮:১

৫৭ ইবন জারীর, *তাফসীর আত-তাবারী* (বয়রুত: দারুল মা'আরি আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৯) খ.০৯, পৃ. ১০৯; আল কাসিম ইবন সালাম আবূ 'উবায়দ, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: পাকিস্তান, ইদারাতু তাহকীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ৩১৫

৫৮ আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, (কায়রো: মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন, "তোমরা জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।"[৫৯]

"স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার ন্যায় মালে গনীমতের বণ্টন পদ্ধতিও বলে দেন। তাই বদর যুদ্ধের পর রাসূল (স.) সর্বপ্রথম যে মালে গনীমতকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেন তা হল বনু কায়নুকা'র মালে গনীমত।"[৬০]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী মালে গনীমতের সিংহভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে বাকি পাঁচ ভাগের এক অংশ বায়তুলমালে জমা করেন।

প্রসঙ্গত দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ্যযোগ্য। আর তা হলঃ

১. বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই নিঃস্বদের প্রতি কখনো উপক্ষো প্রদর্শন করা হয়নি। বৃটেন অর্থনৈতিক উন্নতির উচ্চশিখরে পৌছার পরই সরকারি ব্যয় বরাদ্দের সময় গরীব এবং নিঃস্বদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেখানকার বেকাররা ডোল নামক একটি আর্থিক সাহায্য পেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানে 'বেভারেজ স্কিম'কে মোটামুটি কার্যকরী করা হচ্ছে এবং বিত্তহীনদের অভাব-অভিযোগ দূর করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু কুর'আন প্রথম অবস্থায়ই বায়তুলমাল থেকে গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্যদান এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। বায়তুলমালে, মালে গনীমতের যে খুমুস দাখিল করা হত তার মধ্যেও একটি নির্দিষ্ট খাত ছিল-যার দ্বারা ইয়াতীম এবং মুসাফিরদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হত। কিন্তু যেহেতু মালে গনীমত কোন স্থায়ী আমদানি (আয়) নয়, তাই স্থায়ী আমদানি (যেমন-সাদাকা) এর মধ্যেও নিঃস্ব এবং বেকারদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল। সাদাকা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

২. প্রাচীণ আরবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেসব নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার বিপরীত নিময়-নীতি প্রচলন করেন। তিনি মালে গনীমতের সিংহ ভাগ অর্থাৎ চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং বায়তুলমালের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাখতেন। এ পঞ্চমাংশ সম্পর্কেও তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'তোমাদের মালে গনীমতের মধ্যে আমার অংশ হল মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং এ অংশও তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৬১]

---

৫৯ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ আল-কুর'আন, ৮:৪১

৬০ মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, দ্বাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৬১ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (নয়া দিল্লী: ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭), কিতাবুল জিহাদ

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বায়তুল মালের খুমুস আয়ের একটি বিরাট অংশ জনকল্যাণমূলক কাজ অর্থাৎ নিঃস্ব, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হত এবং মোট মালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক অংশের পাঁচ ভাগের এক অংশ অর্থাৎ পঁচিশভাগের এক ভাগ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হত।[৬১]

"আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্র যুগে খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত-একভাগ আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের জন্য, একভাগ 'যাভিল কুরবার' (আত্মীয়-স্বজন) জন্য এবং তিনভাগ, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" "হযরত আবূ বকর, 'উমর এবং 'উসমান (রা.) খুমুসকে মোট তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা রাসূলের অংশ ও 'যাভিল কুরবা'র অংশ বাতিল করে দন।" অতঃপর হযরত আলী (রা.) হযরত আবূ বকর, 'উমর এবং 'উসমান (রা.) এর বণ্টন পদ্ধতিকেই বহাল রাখেন।"[৬৩]

হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল হানাফিয়া বলেন, রাসূলে কারীমের ওফাতের পর তাঁর এবং 'যাভিল কুরবা'র অংশ নিয়ে মতভেদ শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন, 'রাসূলে কারীমের অংশ তাঁর পর তাঁর খলীফারই পাওয়া উচিত।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'যাভিল কুরবা'র অংশটি রাসূলুল্লাহ্র আত্মীয়-স্বজনদের পাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ দু'টি অংশ অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্মের উপর (যুদ্ধ সরঞ্জামাদি) খরচ করা হবে।"[৬৪]

মালে ফাই-এর ব্যয়

"যে সমস্ত মাল যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই অমুসলিমদের কাছ থেকে লাভ করা হয় তাই হচ্ছে মালে ফাই। চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বনূ নাযীরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে তাদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-কৃষি এবং পরবর্তী সময়ে বনূ কুরায়যার এলাকা, তাদের মাল-আসবাব এবং খায়বারেরও কয়েকটি এলাকা যুদ্ধ ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্র অধিকারে আসে। যেহেতু মালে ফাইয়ের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য মালে গনীমত থেকে আলাদা, তাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) কুর'আনের আয়াতের আলোকে তাকে সরকারি সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন।

"আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই দিয়েছেন, তারজন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৬৫]

---

৬১ বিস্তারিত, আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ইদারাতু তাহকীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ৩২৫

৬২ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ* (বয়রুত: লেবানন, দারুল মা'রেফা, ১৯৭৯), পৃ. ১১; *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৬৩ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

৬৪ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
আল-কুর'আন, ৫৯ : ৬

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ্ (স.) মালে ফাইকে সরকারি মালিকানাধীণ সম্পত্তি ঘোষণা করে তা নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখেন এবং পরবর্তী সময়ে নিজ অধিকার বলে বনূ নাযীরের কিছু এলাকা মুহাজির এবং নিঃস্ব আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।" "মালে ফাইয়ের ব্যয় সম্পর্কে হযরত 'উমর (রা.) বলেন, বনূ নাযীরের ধন-সম্পদ এমনি ধরনের ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ ছাড়াই সেগুলো তাঁর রাসূলকে দান করেন। এজন্য মুসলিমগনকে উট-ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি (যুদ্ধ করতে হয়নি)। অতএব রাসূল (স.) সেগুলোকে নিজেই গ্রহণ করেন। তিনি এ থেকে সারাবছরের খরচাদি বের করে তার পরিবার-পরিজনকে দিতেন এবং যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া (যুদ্ধের জন্য) এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য খরচ করতেন।"[৬৬]

মালে গনীমতের শুধু এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে আসত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যয় হত। কিন্তু মালে ফাইয়ের সমস্তটাই বায়তুলমালে জমা করা হত। মালে ফাই-এর খুমুসের (পাঁচ ভাগের এক অংশ ব্যয় সম্পর্কে কুর'আন শরীফে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর বাকি পাঁচ ভাগের চার অংশ রাষ্ট্রনায়কের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মালে গনীমত এবং মালে ফাইয়ের খুমুসের ব্যয়-খাত একই।"[৬৭]

"ইমাম আবূ হানীফার মতে, 'ফাই'এর মধ্যে খুমুস নেই। কিন্তু তার এ উক্তি কুর'আনী নাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে হয়।"[৬৮] কুর'আন শরীফে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"[৬৯]

"অতএব খুমুসকে পাঁচটি সমান অংশে বিভক্ত করা হত। এক অংশ রাসূলুল্লাহ্র জন্য-যা তিনি জীবিত অবস্থায় নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য এবং মুসলিমগণের কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় করতেন। রাসূল (স.)- এর ওফাতের পর এ সম্পর্কে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। যারা নবীদের উত্তরাধিকারের পক্ষপাতী তারা বলেন, এ অংশ রাসূলুল্লাহ্র (স.) এর উত্তরাধিকারীরাই পাবে। আবূ সওরের মতে এ অংশ ইমামেরই (রাষ্ট্রনায়ক) প্রাপ্য। কেননা রাসূলের ওফাতের পর তিনিই তো তাঁর মূল উত্তরাধিকারী। ইমাম আবূ হানীফার মতে, 'রাসূলের ওফাতের সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকারও বাতিল হয়ে গেছে।' ইমাম শাফিয়ীর মতে, 'এ অংশ মুসলিমগণের কল্যাণার্থে, যেমন-সৈন্যদের বেতন, সওয়ারী এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, দুর্গ এবং পুল মেরামত, কাজী এবং ইমামদের বেতন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় করা হবে।[৭০]

---

[৬৬] *সহীহ বুখারী*, পারা. ১১, কিতাবুল জিহাদ

[৬৭] মায়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; আবূ ইয়ালা, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[৬৮] আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বয়রূত: লোবনান, দারুল মা'রিফা, ১৯৮১) কিতাবুল জিহাদ

[৬৯] ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم
আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭

[৭০] মাওয়ারদী, দ্বাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অংশ 'যাভিল কুরবাদের জন্য। ইমাম আবূ হানীফার মতে, এখন ওদের এ অংশও বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফি'য়ীর মতে বাতিল হয়নি। "'যাভিল কুরবা' দ্বারা শুধু আবদে মানাফ, বনূ হাশিম এবং বনূ আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে বোঝায়-অন্যান্য কুরাইশ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে ছোট-বড়, বিত্তহীন-বিত্তশালী সকলে সমান অংশ পাবে, অবশ্য পুরুষলোকেরা পাবে স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ।"[৭১]

"তৃতীয় অংশ অভাবগ্রস্ত ইয়াতীমদের জন্য। যে সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের পিতা মারা গেছেন তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।"

চতুর্থ অংশ মিসকীনদের জন্য। মিসকীন হচ্ছে মালে ফাইয়ের ঐ সমস্ত অধিকারী যাদের জীবিকার সংস্থান নেই। মালে ফাইয়ের মিসকীন সাদাকার মিসকীন হতে ভিন্ন।[৭২] সাদাকা মালদার মুসলমানদের থেকে নিয়ে নিঃস্ব মুসলিমগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু মালে ফাই থেকে মুসলিম, অমুসলিম সকল মিসকীনই সমান ভাবে সাহায্য পায়।

পঞ্চম অংশ ইবনুস্ সাবীলদের জন্য। ইবনুস্ সাবীল বলতে ঐসমস্ত মুসাফিরকে বোঝায় যাদের কাছে পাথেয় নেই। যারা সফরে বের হবে এবং যারা ইতোমধ্যে বের হয়ে গেছে-তারা সকলেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

"বাকি চার-পঞ্চমাংশ মাল বণ্টনের ব্যাপারে দু'টি উক্তি আছে। যেমন ঃ ১. এটা শুধু সেনাবাহিনীর জন্য। এ থেকে সৈন্যদের বেতন দেয়া হবে এবং অন্য কেউ এর অংশিদার হবে না। ২. জনকল্যাণমূলক কাজ, সৈন্যদের বেতন এবং যে কাজ মুসলিমগণের জন্য জরুরি তাতেই ব্যয় করা হবে। মালে ফাইকে সাদাকার অধিকারীদের মধ্যে এবং সাদাকাকে মালে ফাইয়ের অধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়িয হবে না।"[৭৩]

ইমাম মাওয়ারদীর ধারণা এ যে, "খুব সম্ভব হযরত 'উসমানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার কারণ এ ছিল যে, তিনি সর্ব প্রকার 'দান' (আতিয়া) 'মালে ফাই' থেকে করতেন এবং সাদাক ও ফাইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।"[৭৪]

"যদি ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) মুসলিমগনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। যেমন-পত্রবাহক, রাষ্ট্রদূত এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলূবকে (যাদের মন জয় করা হয়) সাহায্য করা। তাহলে তিনি সে উদ্দেশ্যও মালে ফাই খরচ করতে পারেন।"[৭৫]

---

[৭১] মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
[৭২] প্রাগুক্ত
[৭৩] প্রাগুক্ত
[৭৪] মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; আবূল ইয়ালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
[৭৫] মাওয়ারদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মালে ফাইয়ের এক পঞ্চমাংশ কিভাবে খরচ করা হবে কুর'আন মাজীদে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে; কিন্তু চার-পঞ্চমাংশ কিভাবে ব্যয় করা হবে তার কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। অতএব ইমাম তার ইজতিহাদ এবং এখতিয়ার অনুযায়ী এগুলো ব্যয় করবেন। মালে গনীমত এবং মালে ফাইয়ের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা সম্পর্কে যখন ফকীহদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে তখন এর শেষ মীমাংসা রাষ্ট্রনায়কের মতামতের উপরই নির্ভর করবে।

যাকাত এর ব্যয়

মালে ফাই এবং মালে গনীমতের খুমুসের ন্যায় যাকাতের ব্যয়খাতও কুর'আন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে। সাদাকার মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। যেমন-(১) আদায় ও (২) বণ্টন।"[৭৬]

যারা যাকাত পাওয়ারযোগ্য তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসশ্লিষ্ট, কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞাময়।"[৭৭]

"ইতোপূর্বে রাসূল (স.) নিজের মতানুযায়ী মাল বণ্টন করতেন। একদা জনৈক মুনাফিক অশিষ্টের মত তাঁকে বলে ফেলে, 'মুহাম্মদ, ন্যায় বিচার কর'। রাসূল (স.) তখন বলে উঠলেন, 'তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক, আমি যদি ন্যায় বিচার না করি তাহলে আর কে করবে?' অতঃপর উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।"[৭৮]

ফকীহগণ যাকাতের সম্পদে ফকীরদের অধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা যাকাতের মালকে সাধারণভাবে ব্যবহার বৈধ মনে করেননি। যেমন, সৈন্যদের বেতন ইত্যাদি বাবদ যাকাতের মাল ব্যবহার করা যায় না। তবে সরকারের বাজেটে যদি ঘাটতি দেখা দেয় এবং যাকাতের বায়তুলমালে যদি উদ্ধৃত থাকে তাহলে সেখান থেকে ধার নিয়ে সরকারি বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা যায়। অতঃপর যখন সরকারি বাজেটে উদ্ধৃত হবে তখন যাকাতের বাজেট থেকে ধারকৃত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের যাকাত ও সাদাকার সম্পদ থেকে ব্যয়ের প্রশ্নে আল্লাহ্র ভয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে। প্রত্যেক ফকীরকে সাদাকা বা যাকাতের সম্পদ থেকে তার হক দিয়ে দেবে এমনকি তাকে ও তার পরিবারকে ধনী বানিয়ে দেবে। যদি কিছু মুসলিম গরীব থাকে এবং বায়তুলমালে সাদাকা প্রভৃতি না থাকে তাহলে মুসলিম

---

[৭৬] মাওয়ারদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; বিস্তারিত বিবরণের জন্য *তাফসীরে তাবারী*, খ. ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৫

[৭৭] إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم আল-কুর'আন, ০৯ : ৬০

[৭৮] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল বায়যাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল*, দার আল-কুতুব আল আরাবিয়া, মিশর, সন নেই, খ.০১, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

শাসক খারাজের বায়তুলমাল থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে। এতে সাদাকার বায়তুলমালের উপর কোন ঋণ আরোপিত হবে না। অর্থাৎ তা পরিশোধ করতে হবে না। এজন্য যখন শাসকেরা সাদাকার বায়তুলমাল থেকে অংশ অন্য খাতে ব্যয় করবেন তখন তা বায়তুল মালের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে, কেননা তাতে ফকীরদের অধিকার রয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, "আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক দায়িত্বশীল। অতএব যেলোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মরে গেল এবং সে ঋণ পরিশোধ করার মত কিছুই রেখে যায়নি, তার এ ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর যে লোক ধনমাল রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে।"[৭৯]

তিনি আরো বলেন, "যে লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে অথবা সহায়-সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মরে যাবে, পরে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা এরূপ অবস্থায় আমিই তাদের অভিভাবক।"[৮০] "যে লোক ধন-মাল রেখে মারা যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা, অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।"[৮১]

হযরত 'উমর (রা.) এর এ হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী বলেছেন: এ হাদীসই দলীল যে, মুসলিম জাহানের শাসক সাধারণ মানুষের মতই। এ ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে তার বেশি মর্যাদা নেই। গনীমতের সম্পদ প্রভৃতি থেকে তাকে আগে অথবা বেশি দেয়া যায় না। এমনিভাবে এ হাদীস এ কথারও দলীল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়ার অধীনে প্রত্যেক মানুষ সে যতদূরেই থাকুক না কেন এবং তার শান যত ছোটই হোক না কেন সে সামষ্টিক সম্পদ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার হক ও প্রয়োজনানুযায়ী তার অংশ পেয়ে যাবে।[৮২]

ফারুকে আযম (রা.) হযরত খালিদকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'এ ধন মাল সরকারি ব্যবস্থাধীন। তা একান্ত ভাবে গরীব জনগণের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।[৮৩]

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নিজের কিতাব *আল-খারাজে* যে চুক্তির বিবরণ নকল করেছেন, যা হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা.) ইরাকের হীরা এলাকার খৃস্টানদের সাথে সম্পাদন করেছিলেন। এ রাজনৈতিক দলীলে পরিস্কারভাবে লেখা ছিল যে, তাদের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা, রোগ ও বার্ধক্য তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং তাদের খরচ-খরচা মুসলিমগণের বায়তুলমাল থেকে দেয়া হবে। ইতিহাসে এ সামাজিক নিরাপত্তার এটাই প্রথম উদাহরণ।

---

[৭৯] *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুল ফারা'ইয, বাব নং-৪

[৮০] من ترك دينا او ضياعا فليأتنى فانا مولاه *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুল ইসতিকরায, বাব নং-১১

[৮১] من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلينا *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুন নাফাকাত, বাব নং-১৫

[৮২] মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, ১৩৪৪ হি. খ. ২, পৃ. ৭৯

[৮৩] আলী ইবন আবু বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ* (কায়রো: মাকতাবাত আল-কুদস, ১৩৫১ হি.), কিতাবুল মানাকিব, পৃ. ৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

এতে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম বাসিন্দাদের ভরণ-পোষণ এমন এক সুন্নাত হয়ে গিয়েছিল যা ভবিষ্যতের আদিল খলীফাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে গিয়েছিল। কেননা শরী'আতের আলোকে রচিত খুলাফায়ে রাশিদার নীতিই ইসলামের অংশ এবং তা মানা মুসলিমগণের জন্য ফরয। যেমন রাসূলের সুন্নাত মানাও ফরয।

হযরত 'উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদী ইবন আরতাতকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ চিঠিতে তিনি তাকে বসরার জনগণকে বিশেষ করে বৃদ্ধ যিম্মী, কর্মশক্তিহীন, অক্ষম এবং উপার্জন-উপায়হীন লোকদেরকে প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় রায়তুলমাল থেকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বায়তুল মালের সামাজিক নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব শুধু মুসলিম ফকীরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম যিম্মীরও এ নিরাপত্তা লাভ করার অধিকার রয়েছে। সেও মুসলমগণের মত বায়তুলমালের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। উপরের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে। যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারের স্থায়ী আয়ের উৎস এত কম হয় যে, তা দিয়ে ফকীর-মিসকীনদের ভরণ-পোণ অসম্ভব। তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকরা ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবে এবং তা দিয়ে ফকীরদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ এ নয় যে ধনীদের সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং অক্ষম ও অসহায়দের প্রাকৃতিক আইনের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে যাতে তারা এ আইনের চাপে পিষ্ট হয় বা শেষ হয়ে যায়। যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীন অর্থনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা এডাম স্মীথ প্রমুখ বলে থাকেন। তারা বলেন সরকারের প্রথম দায়িত্ব হল সে চিন্তাশীলদেরকে অক্ষমদের হাত থেকে রক্ষা করবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তারা বলে থাকেন যে সমাজের ব্যক্তিবর্গ শুধু অর্থনৈতিক উপাদান। অর্থনৈতিক উৎপাদন ও লাভের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের দ্বারা তারা সম্পৃক্ত নয়।

পিতার দায়িত্ব শুধু পরিবারে হিফাযত করা নয় বরং সে তাদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। এমনিভাবে জাতির শাসককে সে সকল প্রজাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে যাদেরকে আল্লাহ তার অধীন করেছেন। হযরত 'উমর (রা.) বলতেন, "ফোরাত নদীর তীরে একটি উটও যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে মারা যায়, তাহলেও আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ হয়ত আমার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন, উটটির চলার পথ কেন সমতল করনি?"[৮৪]

---

[৮৪] لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت ان يسألنى الله عنه — তাবাকাতে ইবন সা'দ, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

'উমর ইব্ন আবদুল আযীয খলীফা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে কত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর উপরিউক্ত ভাষণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুত ইসলাম যে রাষ্ট্রপ্রধানের উপরই সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অর্পন করে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ ও অকাট্য প্রমাণ।

যখন জনগণ হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আযীযের নিকট বায়'আত করল এবং তার খিলাফত কায়েম হয়ে গেল তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর গোলাম তাঁকে বলল, "কোন কারণে আপনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? অথচ এ সময়তো দুশ্চিন্তা ও চিন্তা-ভাবনার সময় নয়।" তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক! আমি কেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের হক আদায়ের জন্য আমার কাছে দাবি জানাচ্ছে। তারা তাদের হক বা অধিকারের ব্যাপারে আমাকে লিখুক বা না লিখুক।" এ রাশিদ খলীফার দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তিনি পূর্ব বা পশ্চিমে বসবাসকারী প্রত্যেক উম্মতের ব্যাপারে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করেছেন এবং অনুভূতি রাখতেন যে প্রত্যেক উম্মাত বিশেষ করে অসহায়, দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ, বিধবা এবং ইয়াতীমের অধিকার আদায় তার উপর ফরয।

ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম, ভাল ও উত্তম কাজের দা'ওয়াত প্রদান, ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাই হল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। ন্যায় ও ইনসাফ এবং ভাল কাজের বিপরীতধর্মী ব্যাপার হল দুর্বল ও অসাহয় লোক ভুখা থাকবে এবং ফকীর-মিসকীন খানা-পিনা, পোশাক, বাসস্থানের মত জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে মাহরুম থাকবে। অথচ সমাজের বিত্তশালীদের নিকট যথেষ্ট সম্পদ অহেতুক পড়ে থাকবে-এটা কোনক্রমেই হতে পারে না। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সমস্যা সমাধান এবং ফকীরদের সচ্ছল জীবন প্রদানে বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বনও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যাতে সমাজে পারস্পরিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হাসিল হয়। এ মাধ্যম স্থান, কাল ভিন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হতে পারে এবং ইসলামী উম্মাহর ক্ষমতাবান ও বিজ্ঞ লোকদের জন্য ইজতিহাদের পথও খোলা রয়েছে। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে উদাহরণ স্বরূপ অনেক পন্থার মধ্যে শুধু একটি পন্থার কথাই উল্লেখ করাই যথেষ্ট। এ পন্থা হযরত 'উমর (রা.) অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মদীনার নিকট 'রাবযাহ' নামক এক খন্ড জমি সরকারি মালিকানায় আনলেন। যাতে মুসলিমগণের গবাদি পশু চরতে পারে। কিন্তু তিনি সরকারি মালিকানায় আনাই যথেষ্ট মনে করলেন না বরং তিনি ফকীর-মিসকীন এবং কম আয়ের মুসলিমগণের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলেন। যাতে তারা বিনা ব্যয়ে চারণ ভূমিকে নিজেদের গবাদি সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বানিয়ে নিতে পারেন এবং সরকারের কাছে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা না চান। এ উদ্দেশ্য হযরত 'উমরের (রা.) নির্দেশ সুস্পষ্ট রয়েছে। তিনি চারণভূমিটির তত্ত্বাবধায়ক হুনির প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে হুনি, মানুষের সাথে নরম ব্যবহার এবং মযলুমের দোয়াকে ভয় কর। কেননা তাদের দোয়া কবুল করা হয়। কম উট এবং কম বকরীর মালিকদেরকে চারণ ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দেবে। ইব্ন 'আফফান ও ইব্ন 'আওয়াফের গবাদি পশুকে (অর্থাৎ উম্মাতের আমীরদর উট ও ভেড়া বকরী) থাকতে দিও না। কেননা তাদের গবাদিপশু হালাক হয়ে গেলে তারা নিজেদের অন্য ক্ষেত এবং খেজুরের বাগানের দিকে ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট অন্য সম্পদ এবং আমদানির মাধ্যমে রয়েছে। আর এ সব মিসকীনের (কম উট এবং বকরীর মালিক) গবাদি পশু হালাক হয়ে গেলে নিজের সন্তান-সন্ততি সহ আমার কাছে এসে চিৎকার দিয়ে বলবে, "হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করব? আমি কি তাদের বাবা নই? এ জন্য তাদের ধন সম্পদ সরবরাহ করা থেকে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।"[৮৫]

হযরত 'উমরের (রা.) উল্লিখিত নির্দেশে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই রয়েছে। এ নির্দেশে আমরা তিনটি বিষয় পাই। প্রথমত মুসলিম সরকারের জন্য এটা আবশ্যক যে, সকল কম সম্পদ ও কম আয়ের মুসলিমগণের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে এবং তাদের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যাতে তারা কাজ করে রোজগার করবে এবং ধনী হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি ধনী ও বিত্তশালীদের উন্নয়নের প্রশ্নটি খাটোও করতে হয় এবং তাদের সম্পদ লাভের ও আয়ের কিছু কিছু মাধ্যম থেকে বঞ্চিতও করতে হয় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বাধাও দিতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। যেমন হযরত 'উমরের (রা.) এ কথা স্পষ্ট। কথাটি তিনি বলেছিলেন চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ককে। তিনি বলেছিলেন, "কম উট ও বকরীর মালিকদেরকে চারণভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দিও এবং ইব্ন 'আফফান ও ইব্ন 'আওফের গবাদি পশুকে থাকতে দিও না।"

দ্বিতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, যদি তার আয়ের মাধ্যম ধ্বংস হয়ে যায় এবং রুটি রুজির কোন মাধ্যম না থাকে তাহলে সে তৎকালীন শাসকের সামনে হাজির হয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য চিৎকার দিতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগার থেকে সাহায্য প্রদানের দাবিও সে করতে পারবে। তৎকালীন শাসকের অথবা সরকারের তার দাবি পূরণ এবং তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। যেমন হযরত ওমর (রা.) বলেছেন: "এবং এ সব মিসকীনের গবাদি পশু হালাক হয়ে যায় তাহলে সে তার নিজের সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে চিৎকার দেবে যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করব?"

তৃতীয়ত: আমরা এখান থেকে বাস্তবসম্মত হিকমত লাভ করে থাকি। সে হিকমত হল, ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে যারা কাজ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কোন কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে এবং কম আয়ের মুসলিমের আয়ের মাধ্যমের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে ফকীর ও কম আয়ের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এবং শ্রমের কারণে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না থাকে ও বায়তুলমালের উপর বোঝা হয়ে না যায়। এ কথা হযরত 'উমরের (রা.) সেই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, "ধন সম্পদের চেয়ে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।"

---

[৮৫] আবু ওবায়েদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমাল অক্ষমদের সামাজিক নিরাপত্তা

ফকীর শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত শ্রমিককেও বোঝায় যারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অসহায় অবস্থায় এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে। কুর'আনের এক জায়গায় 'ফুকারা' শব্দ ঐ সমস্ত মুহাজিরের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে যারা কুরাইশদের যুলুম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিল এবং এখানে পৌঁছার পর জীবিকার সন্ধান করেছিল। যেমন কুর'আনে বলা হয়েছে, "(বিশেষত উপরিউক্ত মাল) প্রাপ্য হচ্ছে দরিদ্র মুহাজিরদের যারা নিজেদের আবাসভূমি এবং বিষয় সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে (এবং) তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তোষ লাভের কামনা করে।"[৮৬]

এভাবে ঐ সব লোকের উপর 'মিসকীন' শব্দ প্রযোজ্য হবে যাদেরকে রোগ অথবা বার্ধক্য এমনভাবে আসার ও নিষ্কর্মা করে দিয়েছে যে, তারা কোন কাজই করতে পারে না এবং পারলেও বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তা দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। যুদ্ধের দরুন যারা অন্ধ, খঞ্জ, খোঁজা অথবা আতুরে পরিণত হয়েছে তারাও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। "ইমাম আবূ হানীফার মতে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের চেয়েও খারাপ। কেননা মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে অর্থাভাব একেবারে নির্জীব করে দিয়েছে। তবে উভয়কেই (ফকীর এবং মিসকীন) এ পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তারা নিঃস্ব অবস্থা থেকে সচ্ছলতার প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।"[৮৭]

ইসলাম একদিকে যেমন জনসাধারণকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেছে অন্যদিকে তেমনি বেকার, বিকলাঙ্গ এবং অক্ষমদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, "বৃটেনে গীর্জার শাসনের অবসান হওয়ার পর এটা মেনে নেয়া হয়েছে যে, নিঃস্বদের সাহায্য করাও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব এবং অভাবগ্রস্তদের সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে না যতক্ষণ না রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষণে এর যথারীতি ব্যবস্থা থাকে। এরই ভিত্তিতে ১৬০১ খৃস্টাব্দে 'অভাবগ্রস্তদের আইন' পাস করা হয়। যদিও নীতিগতভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, কোন রাষ্ট্র তার নিঃস্ব, ইয়াতীম, উন্মাদ এবং নিরাশ্রয় জনসাধারণকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরতে দেবে না। তবুও অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন কোন পদ্ধতির সাহায্যে দানে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং বৃদ্ধিই পায়। উপরন্তু রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব পালনে অপারগ হয় তাহলে এতে রাষ্ট্রের শুধু দূর্ণামই হয় না, সমগ্র জাতির জন্য এর ফল মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অতএব 'অভাবগ্রস্তদের সাহায্যদান, এমন একটি সমস্যা যা শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়ই সমাধান করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, নিঃস্বদের সাহায্যার্থে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মধ্যে সার্বজনীনতা রয়েছে। কিন্তু সরকারি হস্ত

---

[৮৬] للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا আল-কুর'আন, ৫৯ ঃ ৮

[৮৭] *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেপের অর্থ কখনো এ নয় যে, পারিবারিক সাহায্যদান ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বরং সরকারি ও পারিবারিক সাহায্য দান ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে একটি অন্যটির প্রতিকূল না হয়ে বরং পরিপূরক হয়। তাহলে জাতি সামগ্রিকভাবে এ দু'ব্যবস্থার মাধ্যমেই উপকৃত হতে পারবে। অভাবগ্রস্ত দের এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে আলস্য এবং কর্মবিমুখতা উৎসাহ না পায় এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারীদের উপরও অযথা বোঝা না পড়ে। এটা এমন একটা লক্ষ্য যা এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই পুরোপুরিভাবে অর্জন করতে পারেনি। তবে এটা স্বীকার্য যে এ লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়-খাত পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ কর আরোপ করার প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করতে পারে।"[৮৮]

বায়তুলমাল ও জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার অর্থ এ নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসিয়ে খাওয়াতে থাকবে। বরং লোকেরা সাধ্যানুযায়ী শ্রম করবে, উপার্জন করবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করবে তার পরও যদি কেউ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ থেকে যায় তাহলে তা পরিপূরণে দায়িত্ব হবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থনীতিতে তা হল নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অপূরণীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ কাজ করে না, মনে করতে হবে, সে এ দায়িত্ব পালন করছে না। এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করা হল,"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমহণের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সমূহ আঞ্জাম দেয়ার কর্তৃত্ব দেবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।"[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (স.) অন্যত্র বলেছেন: "যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে অভাব পুরণ করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্র্যতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজা সমূহ তার জন্য বন্ধ করে দেন।"[৯০]

---

৮৮ মাওবদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৮৯ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল 'ইমারা, বাব নং-১৩

৯০ সুনানু তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৬

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে আল্লাহর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এ কারণে খুলাফায়ে রাশিদীনের পরে হযরত আমীর মুয়াবীয়ার শাসনামলে এ কাজের প্রতি যখন, উপেক্ষা প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন তাঁকে রাসূলে কারীম (স.) এর এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি অনতিবিলম্বে এ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন।[৯১]

সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলতঃ জনগণের সে কল্যাণ-কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ দায়িত্ব পালন করবে না তার পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে লোককে আল্লাহ তা'আলা জনগণের শাসক বা পরিচালক বানিয়ে দেবেন, সে যদি তাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না।"[৯২]

বায়তুল মাল থেকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা

ইসলামী সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষনা করেছে বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। "সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ (হুকুম) বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'কারয হাসানা' দানের নির্দেশও (হুকুম) শেষ দিককার বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'কারয হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসূলের ওফাতের বড়জোর এক বছর পূর্বেকার। তাই নবী যুগে এর জন্য কেন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।"[৯৩]

দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের দান-দক্ষিণা প্রদান যেমন প্রত্যেক ধর্মের দৃষ্টিতে পূণ্যের কাজ, তেমনি যে অর্থ বেকার পড়ে থাকে, সে অর্থ ঋণ হিসেবে অন্যকে দান করাও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পূণ্যের কাজ। কুর'আনের অনেক জায়গায় এ সম্পর্কে মুসলিমগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। "কে আছে এমন ব্যক্তি যে, আল্লাহকে ঋণদান করবে সুসঙ্গতভাবে, সেমতে তিনি তাকে বর্ধিত করে দেবেন সে ঋণদাতার অনুকূলে, অধিকন্তু তার জন্য (অবধারিত) আছে এক মহা পূণ্যফল।[৯৪]

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়খাতে 'কারয হাসানা' প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু ইংগিতই যথেষ্ট যে, সরকারি ব্যয়খাতেও 'করযে হাসানা'র জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। হযরত 'উমর (রা.) এবং অন্যান্য খলীফার যুগে এ ধরনের অসংখ্য নযীর পাওয়া যায় যে, লোকেরা নিজেদের

---

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

[৯২] مامن عبد يستر عيه الله ر عية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৮

[৯৩] *সলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[৯৪] مَن ذا الَّذى يُقرِضُ اللَّه قَرضًا حسنًا فَيُضاعفهُ له وله أجرٌ كريمٌ আল-কুর'আন, ৫৭ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

বেতনের জামানতে সরকারি 'বায়তুল মাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করত। ইসলামই প্রথম বিশ্বের নিয়মিত 'কারয হাসানা সমিতি' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন সময়ে একজন সচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব সে যখন অন্য একজন সচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে যখন ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন (কারয হাসানার ব্যবস্থা থাকার দরুন) এ সব অভাবগ্রস্তের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোন কারণই থাকল না।

"খুব সম্ভব দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান এ হতে পারে যে, খোদ রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।"[৯৫]

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খোদ খলীফাও 'বায়তুলমাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকতেন। তাবারী, ইবন সা'দ প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী খলীফা 'উমরের যখন কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ঋণ চাইতেন। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, "অধিকাংশ সময় যখন তিনি রিক্তহস্ত থাকতেন এবং বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি তাঁর কাছে গিয়ে ঋণ তলব করত, তখন তিনি হয় তাঁর কাছে আরো কিছু সময় চাইতেন, নয়তো নিজের বেতন থেকেই ঋণ পরিশোধ করে দিতেন।"[৯৬] ইবন সা'দ প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "হযরত 'উমর (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তার কাছে বায়তুলমালের আশি হাজার দিরহাম পাওনা ছিল।"[৯৭] অতঃপর তাঁর পুত্ররা ঐ ঋণ পরিশোধ করেন। হযরত 'উমর (রা.) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ঐ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলোও মাঝে-মধ্যে জনসাধারণকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

ঋণ পরিশোধ

যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা ঋণগ্রহীতার জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। রাসূলে কারীম (স.) "ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করাকে 'যুলম' আখ্যা দিয়েছেন।" রাসূল (স.) ঋণ পরিশোধের মানসিক দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা পরিশোধ করে দেন। আর যে ব্যক্তি (অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে) তা বিনষ্ট করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তা বিনষ্ট করে দেন।"[৯৮] ঋণ পরিশোধের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স.)

---

[৯৫] *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৯৬] আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলূক* (বৈরূত: ১৯৬৪), পৃ. ২৭৪৭, ২০ হিজরীর ঘটনা; *তাবাকাতে ইবন সা'দ*, খ. ৩, পৃ. ৯৮

[৯৭] *তাবাকাতে ইবন সা'দ*, খ. ৩, পৃ. ২৬০

[৯৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল তা আমরা সে ঘটনা থেকেই পরিস্কার বোঝেনি যেখানে রাসূল (স.) ঋণ মুক্ত সাহাবীর জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন এবং ঋণগ্রস্ত সাহাবীর জানাযার নামাজ না পড়িয়ে সাহাবীদেরকে পড়িয়ে দিতে বলেছেন।

ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে ঋণদাতাকে শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। "যদি বিচারকের (কাযীর) কাছে কারো হক (পাওনা) প্রতিপন্ন হয় এবং হকদার তার ঋণগ্রহীতাকে কয়েদ করাতে চায় তাহলে বিচারক এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না বরং ঋণগ্রহীতাকে নির্দেশ দেবেন যাতে সে তার দেনা পরিশোধ করে ফেলে। কেননা কয়েদ হচ্ছে টালবাহানার শাস্তি, অতএব এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার টালবাহানা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যকীয়।"[৯৯] "অতঃপর সে যদি দেনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক তাকে কয়েদ করবেন। কেননা তখন তার টালবাহানা প্রমাণিত হয়ে গেছে।"[১০০]

যদি বিচারকের সামনে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রহীতা কপর্দকশূন্য এবং দেউলিয়া তাহলে তাকে কয়েদ করা যাবে না বরং এ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে আরো সময় দেয়া হবে। "অতঃপর যখন বাদীর (ঋণদাতার) এ দাবি স্বীকার করে নেয়া হবে যে, ঋণগ্রহীতার হাতে মাল রয়েছে কিংবা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, ঋণগ্রহীতার হাতে সত্যি সত্যি মাল রয়েছে তখন বিচারক তাকে দু'তিন মাস কয়েদখানায় রেখে অতঃপর তার অবস্থা সম্পর্কে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অতএব ঋণগ্রহীতার টালবাহানা প্রমাণিত হওয়ার জন্যই তাকে কয়েদ করা হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হবে যতক্ষণ না সে যে মাল গোপন রেখেছে তার তথ্য প্রকাশ করে।"[১০১]

এ সময়ের মধ্যে বিচারক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ঋণগ্রহীতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন। "যদি তার হাতে মাল আছে বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।"[১০২] ফকীহদের মতে, "কোন দেউলিয়াকে কয়েদ করা যুলুমেরই নামান্তর।"[১০৩]

যখন বিচারক ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেন তখন তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই ঋণদাতার থাকে না। সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) বলেন, যখন ঋণগ্রহীতাকে বিচারক কপর্দকহীন বা দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেন তখন তার এবং তার ঋণদাতাদের মধ্যে অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু যখন ঋণদাতারা এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে যে, ঋণগ্রহীতার কাছে সত্যি সত্যি মাল রয়েছে তখন উপরোক্ত অন্তরায় উঠে যাবে।[১০৪]

---

[৯৯] হিদায়া, খ. ৩
[১০০] প্রাগুক্ত
[১০১] প্রাগুক্ত
[১০২] প্রাগুক্ত
[১০৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যেমন শান্তির ধর্ম তেমনি এর হুকুম আহকাম যদি মানুষ ঠিকভাবে পালন করে তাহলে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি বিরাজ করবে। যাকাত এবং বায়তুলমাল-এর ব্যবহার যদি কোন রাষ্ট্র সঠিক ভাবে পালন করে তাহলে ঐ রাষ্ট্রে কোন অশান্তি থাকতে পারেনা। রাসূল এবং সাহাবাদের যুগের শাসন সারা দুনিয়ার মানবজাতির জন্য আজীবন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম যাকাতের অর্থ বায়তুলমালের মাধ্যমে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ ব্যয় করলে সমাজে কোন অভাবগ্রস্ত মানুষ পাওয়া যাবেনা। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে।

[১০৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার উদ্ভব মূলত রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময় থেকেই এবং ধীরে ধীরে বিকাশ হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নেতৃত্বে যে দিন মদীনাকেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হল, সেদিন ও রাষ্ট্র ছিল তাঁর ঘোষিত আদর্শ, লক্ষ্য ও চরিত্রের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব এবং দৃষ্টান্তহীন। এ সময় দুনিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ছিল ইতর প্রাণীর চেয়েও উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত। দরিদ্র ও অক্ষম লোকদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাবার বা তদের ফরিয়াদ শুনবারও কোন লোক কোথাও ছিল না। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন বাস্তব ব্যবস্থাও ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ মূল্যহীন, গুরুত্বশূণ্য, তারা ছিল চলমান সমাজের উপর এক বোঝা। অসংখ্য মু'মিন মুসলিম রাসূলুল্লাহ (স.) এর আহ্বানে জন্মভূমি মক্কা ও অন্যান্য স্থান ত্যাগ করে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাদের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি সব কিছুই ফেলে এসেছিলেন নিতান্ত সর্বহারা ও ভিখারী হয়ে। কেবলমাত্র হযরত 'উসমান (রা.) তাঁর বিপুল সম্পদের কিয়দংশ সংগে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যরা কেউ কিছু নিয়ে আসতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চাচা হযরত হামযাহ একদা ক্ষুধার তাড়নায় রাসূলের নিকট এসে কিছু খাবার চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১০৫]

নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ছিল না একটি কপর্দকও যার দ্বারা এসব ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধারজ্বালা নিবৃত্ত করা যেতে পারে, দেয়া যেতে পারে পরনের কাপড় বা অবস্থানের জন্য আশ্রয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নিকটতম সঙ্গী হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত 'উমর (রা.) প্রমুখের সাথে পরামর্শ করে মুহাজির ও আনসারদেরকে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। আনসাররা ছিলেন মদনিার আদিম অধিবাসী। তাঁদের যেমন নিজস্ব ঘরবাড়ী ছিল, তেমনি ছিল রুযি-রোযগারের উপায়রূপে ক্ষেত-খামার ও ব্যবসা-বাণিজ্য। তারা তাদের সর্বহারা মুহাজির ভাইদেরকে সহোদর ভাইয়ের তুলনায়ও অধিক আপন রূপে একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা সহকারে গ্রহণ করলেন। আনসারদের এ দৃষ্টান্তহীন আত্মত্যাগের কথা আল্লাহ তা'আলা নিজেই উদাত্ত ভাষায় স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের এ অপরিসীম উদারতার প্রশংসাও করেছেন। বলেছেন,"মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ

---

১০৫ Haykal, *The life of Muhammad* (Delhi: New Crescent Publishing Co., 2000), p. 178

Dhaka University Institutional Repository

করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[১০৬]

একজন আনসার তাঁর মুহাজির ভাইয়ের বসবাসের জন্য তাঁর নিজের ঘরের একাংশ ছেড়ে দিলেন। যাঁর জমি ছিল তিনি তাঁর ভাইকে অর্ধেক দিলেন চাষাবাদ করে নিজের রুযি-রোজগার করার জন্য। আর যার ব্যবসা ছিল তাঁর একাংশ ছেড়ে দিলেন, যেন তিনি ব্যবসায়ের মাধ্যমে রুযি-রোযগার করতে পারেন।[১০৭] হযরত আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রা.) হয়েছিলেন আনসার হযরত সা'দ ইবন রাবী'র ভাই। প্রথমোক্ত জনের কিছুই ছিল না। হযরত সা'দ তাকে মূলধন দয়ার প্রস্তাব করলেন ব্যবসায়ের জন্য। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেনঃ আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দাও। আমি নিজস্বভাবে উপার্জন করব। তিনি বস্তুতই বাজারে পনির ও মাখন বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে দিলেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তার দারিদ্র্য মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্য মুহাজিরও তাঁর এ স্বয়ংসম্পূর্ণতার উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১০৮]

আর যাঁরা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারলেন না-হযরত আবূ বকর, হযরত 'উমর, হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ নিজ নিজ আনসার ভাইয়ের সাথে ফসলের অংশ প্রাপ্তির শর্তে চাষাবাদের কাজে লেগে গেলেন। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক মুহাজির দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁরা দৈহিক শ্রম, কারো বাড়ীর কাজকর্ম ইত্যাদি করে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করলেন। কিন্তু কেউই অন্য লোকের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ করতে প্রস্তুত হলেন না।

কিন্তু মুহাজিরদের আগমন ছিল অব্যাহত। বহু মুহাজিরই এমন ছিলেন যে, উপার্জন তো দূরের কথা, রাতের বেলা আশ্রয় নেয়ার এবং নিদ্রা যাওয়ার জায়গাও তাদের ছিল না। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁদের জন্য রাতের বেলা মসজিদে নববীর বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁরাই 'আসহাবে সুফফা' নামে অভিহিত ও পরিচিত। রাসূলে কারীম (স.) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সাহাবীদের থেকে নিয়ে এদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[১০৯]

---

[১০৫] والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة আল-কুর'আন, ৫৯ : ৯

[১০৬] ان الانصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخو اننا ما نملكم من النخل قال لا فقالوا لا خوانهم تكفونا المونة ونشر ككم في الثمرة قالوا سمعنا واطعنا- *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল হাবস, বাব নং-৫; আদাবুল মুফরাদ অংশে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন

[১০৭] Haykal, Ibid

[১০৮] ইবন হিশাম, *আস-সীরাত আন-নবভীয়া* (বয়রূত: লেবানন, ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫), খ. ৩, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত হাদীস কয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (স.) মুসলিম সমাজকে যে আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার প্রধান দুটি ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও দয়ার্দ্র হৃদয়। ঈমান আল্লাহ-রাসূল ও পরকালের প্রতি। এ ঈমান বাস্তব আনুগত্য সম্বলিত। আর দয়ার্দ্র হৃদয় আল্লাহর গোটা সৃষ্টির প্রতি, সব জীবজন্তু ও মানবকূলের প্রতি।

সমাজ ও ব্যক্তি গঠনের এ চেষ্টা-সাধনা রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্বকল্পিত নয়। আল্লাহই তাঁকে বলে দিয়েছিলেন কুর'আনের এ আয়াতটির মাধ্যমে, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে: তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।"[১১০]

এ আয়াত এবং উপরে উদ্ধৃত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহর রাসূল (স.) ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মুসলিমকে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জনসমষ্টিকে মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলতে চেয়েছিলেন ও সচেষ্ট ছিলেন। আর এরই পরিণতিতে মুসলিম সমাজের সমন্বয়ে যে ইসলামী রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মানবতার সার্বিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন এবং বৈষয়িক ও নৈতিক কল্যাণ সাধনই ছিল তার একমাত্র দায়িত্ব ও লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোষণা করেছিলেনঃ "সমগ্র মানুষই আল্লাহর পরিবার, তারই লালন-পালন মুখাপেক্ষী।"[১১১]

অতএব আল্লাহর পরিবারের কোন জীব অভুক্ত থাকবে, আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি কোন মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাবে, তা কখনই হতে পারে না। তাদের জন্য অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা হতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকে।

তাই এ আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের আদর্শিক নেতা ও মুখপাত্র হিসেবেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘোষণা করেছিলেন জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার কথা। তাঁর এ পর্যায়ের ঘোষণাবলীর কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিক দায়িত্বশীল। অতএব যে লোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মরে গেল এবং সে ঋণ পরিশোধ করার মত কিছুই রেখে যায়নি, তার এ ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর যে লোক ধনমাল রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে।"[১১২]

---

১১০ كنتم خير امة اخر جت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله আল-কুর'আন, ৩ : ১১০

১১১ الناس كلهم عيال الله সহীহ মুসলিম, কিতাবুল 'ইতফ, হাদীস নং-১৬

১১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন: "যে লোক ঋণগ্রস্থ হয়ে অথবা সহায়-সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মরে যাবে, পরে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেনা এরূপ অবস্থায় আমিই তাদের অভিভাবক।"[১১৩] "যে লোক ধন-মাল রেখে মারা যাবে, তা তার উত্তরাধিকারী পাবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা, অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।"[১১৪]

উপরে উদ্ধৃত ঘোষণাবলীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স.) মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বর্তমান যুগের 'সামাজিক নিরাপত্তার' নিশ্চয়তাই ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুত বিপদসংকুল এ পার্থিব জীবনে মানুষের মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি, অস্বস্তির প্রধান কারণ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। এ ক্ষেত্রে ধনী-নির্ধণ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, চাষা, গৃহস্থ সকলেই সমান। সকলের মনে নিজ নিজ জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এক প্রকারের উদ্বেগ সদা সক্রিয় এবং উদ্বেগ থাকে বংশধরদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য। ধনীর জন্য যে কোন মুহূর্তে নিঃশেষ বা লুণ্ঠিত হয়ে যেতে পারে, ব্যবসায়ীর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং চাষীর ক্ষেত-খামারে ফসল নাও ফলতে পারে। যদি তা হয়ই তাহলে তার নিজের অবস্থাই বা কি দাঁড়াবে এবং এ অবস্থায় মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীদেরই বা কি দশা হবে? এ খাতেই প্রবাহিত থাকে সব মানুষের চিন্তা ভাবনা। এরূপ অবস্থায় তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিরাপত্তার বাণী ধ্বনিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। তা শুনতে পাওয়ার জন্য তারা উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

দুনিয়ার ধর্ম বা মতাদর্শ ভিত্তিক-বিধানের মধ্যে ইসলামই একমাত্র বিধান যার নিকট থেকে মানুষ এ নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস লাভ করতে পারে এবং পেরেছে।

এ আশ্বাস মৌলিকভাবে দিয়েছেন সারা জাহানের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। পরে তাঁরই অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব পালনকারী ইসলামী রাষ্ট্র ও নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে। রাসূলুল্লাহ (স.) যেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এ নিরাপত্তার কথাই ঘোষণা করেছিলেন। এ ঘোষণা ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষ থেকে ছিল না। কেননা কোন ব্যক্তির পক্ষেই এরূপ ঘোষনা দেয়া এবং কার্যত তার বোঝা বহন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। তিনি এ ঘোষনা দিয়েছিলেন প্রথম মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে। কেননা তিনিই ছিলেন দুনিয়ার মানুষের প্রতি চিরকালের জন্য আল্লাহর সর্বশেষ মুখপাত্র। দ্বিতীয়ত, তিনি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। কেননা রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এ নিরাপত্তা প্রদান।

انا اولى بالمومنين من انفسهم فمن مات و عليه دين ولم يترك وفاء فعلى قضائه ومن ترك مالا فلورثته *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ফারা'ইয, বাব নং-৪

[১১৩] من ترك دينا او ضياعا فليا تينى فانا مولاه *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ইসতিকরায, বাব নং-১১

[১১৪] من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلينا *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নাফাকাত, বাব নং-১৫

Dhaka University Institutional Repository

এ নিরাপত্তাদানের আশ্বাসবাণী পেয়েই মানুষ লাভ করতে পারে পরম স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা। ধনীর ধন হাতছাড়া হয়ে থাকে, ব্যবসায়ীর ব্যবসা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ুক, চাকুরের চাকরি বিচ্যুতি ঘটুক, চাষীর ফসল পোকায় খেয়ে ফেলুক বা বন্যায় ভেসে যাক কিংবা নাবালক-অক্ষম-অসহায় সন্তান রেখে মরে যাওয়ার ঘটনাই ঘটুক-সেজন্য কারোরই উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কোন কারণ থাকবে না। কেননা এ সব অবস্থায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রই হবে প্রত্যেকের অভিভাবক।

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর উপরিউক্ত ঘোষণাবলী বাস্তবতা বর্জিত নিছক ঘোষণা মাত্রই ছিল না। কার্যতই তিনি তা করেছিলেন। রাষ্ট্রের বায়তুলমালকে তিনি পুরোপুরিভাবে এ উদ্দোশ্যই ব্যবহার করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা যা কিছুই সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন, তা তিনি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনে ব্যয় করতেন। হযরত মু'আয (রা.) কে তিনি ইয়ামানের শাসনকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন। তখন তাঁকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে যে বিস্তারিত হিদায়াত দিয়েছিলেন, তাতে যাকাত সম্পর্কে বলেছিলেন, "অতঃপর তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে নিয়ে তাদেরই দরিদ্র জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।" ফলে প্রত্যেক ফকীর ও মিসকীন বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনমত সাহায্য পেত। বিবাহিত দম্পত্তি দু'জনের এবং সন্তান-সন্ততি সম্বলিত পরিবারের সকলে তাদের প্রয়োজন মত লাভ করত। অন্ধ পেত তাকে হাত ধরে পথ চালিয়ে নেয়ার লোক। চলাফেরা করতে অক্ষম লোকেরা ঘরে থেকেই প্রয়োজনমত পেয়ে যেত। দুরে পথ চালিয়ে নেয়ার লোক চলফেরা করতে অক্ষম লোকেরা ঘরে থেকেই প্রয়োজনমত পেয়ে যেত। ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করে দেয়া হত। যে লোক অসহায়, নিৎসম্বল বালক-বালিকা, স্ত্রী রেখে মরে যেত, মৃত্যুর পর এসব লোক পেত বেঁচে থাকার আশ্রয় ও সম্বল। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের হৃত সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। সাধারণ মানুষ মুর্খতা, ভয়–ভাতি ও দারিদ্র্য থেকে নিস্কৃতি পেল। বাহরাইন থেকে সর্বপ্রথম আসা বিপুল সম্পদ রাসূলের নির্দেশে মদীনাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হল।

উল্লেখ্য যে, এ সময় পর্যন্ত সুদী ব্যবসা সমগ্র আরব তথা সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে চলছিল। ফলে ধনীদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছিল জনগণ। অভাবগ্রস্ত লোকেরা নিজেদের জীবন রক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে ব্যবসা করার জন্য যে মূলধনের মুখাপেক্ষা হত, তা ধনী লোকদের কাছ থেকে চক্রবৃদ্বিহারে সুদের ভিত্তিতে গ্রহণ করত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সুদ রহিত করে শোষিত-নির্যাতিত জনগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সুদ রহিত করণ সংক্রান্ত তার এ ঘোষণা ছিল পুরোমাত্রায় বিপ্লবাত্মক। এটি ছিল শোষিত নির্যাতিত গণ-মানুষের জন্য মুক্তিসনদ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ মহানবী (স.)-এর সময় থেকেই শুরু হয় এবং তা ধীরে ধীরে আরো বিকাশ লাভ করতে থাকে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদার আসলে এ বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে এবং আজ পর্যন্ত ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশের ধারা অব্যাহত আছে। নিম্নে খুলাফায়ে রাশিদার আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তার বিকাশ সম্মন্ধে আলোকপাত করা হলো।

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা নিযুক্ত হলেন। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরই তিনি যে, নীতি নির্ধারণী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন,

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, আমি তার নিকট থেকে জনগণের অধিকার আদায় করে নেব এবং তোমাদের মধ্যকার দুর্বলতার ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী তার অধিকার আমি অবশ্যই আদায় করে দেব।[১১৫]

এ সময় কতিপয় গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যেহেতু তার অর্থ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেয়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল ও ব্যর্থ করে দেয়া, তাই খলীফা ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সময়ে তারা যে যাকাত দিত, তার একটি উটের রশিও যদি আমার সময়ে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব।[১১৬]

যাকাত বন্ধ হয়ে গেলে জনগণকে দেয়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রাখা রাষ্ট্রের পক্ষ সম্ভবপর হত না। আর তা বন্ধ হয়ে গেলে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু রাসূলের সাহাবীগণ তা কোনক্রমেই বরদাশত করতে রাযী হতে পারেন না। তাই যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

---

১১৫ وان اقرى كم عندى الضعيف حتى اخذ منه الحق وان اضعفكم عندى القوى حتى اخذ له الحق- আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: পাকিস্তান, ইদারাতু তাহ্কীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ১২

১১৬ والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা কার্যত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখারই ঘোষণা। মানবতার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১১৭]

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা হযরত আবু বকর (রা.) এর সমগ্র খিলাফত আমলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবিত থাকাকালীন সময়ের মতই অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এমনকি এ সময়ে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ইরাক এলাকায় যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি হীরাবাসী খৃষ্টানদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বার্ধক্য, রোগাক্রান্ত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এ চুক্তিতে লিখিত ছিলঃ "যে বৃদ্ধ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা কোন আকস্মিক বিপদে পড়ে গেছে অথবা পূর্বে ধনী ও সচ্ছল ছিল এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে আর তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে, এরূপ ব্যক্তির উপর সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকবে ততদিন ধার্য জিযিয়া প্রত্যাহার হবে এবং মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তার ও তার পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে আর তারা যদি 'দারুল ইসলাম' এবং 'দারুল হিজরাত' ত্যাগ করে চলে যায়, তা হলে তাদের পরিবারবর্গের ব্যয়ভার বহনের কোন দায়িত্ব মুসলমানদের উপর থাকবে না।[১১৮]

হযরত খালিদ (রা.) সেনাপতি হিসেবে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং তখনকার খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। অতএব এ নীতি সম্পর্কে সকল সাহাবীর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে বলা চলে।

হযরত আবূ বকর (রা.) এর পর হযরত উমর ফারুক (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন। এ সময়ই পারস্য রোমানদের সাথে যুদ্ধ চলছিল এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন। তখন 'উমর (রা.) এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র যেমন বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দিক দিয়ে অধিকতর সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। 'উমর (রা.)-এর সময়ের কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সচিবালয় 'দেওয়ান' গড়ে তোলা। তাতে ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত আয়ের উৎসের সাথে সাথে ব্যয়ের খাতসমূহও সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়। তাতে বিভিন্ন কাজের ভারপ্রাপ্তদের নাম ঠিকানা এবং রাষ্ট্রের অধীন যেসব অভাবগ্রস্ত লোক বায়তুলমাল থেকে সাহায্য লাভের উপযুক্ত তাদের তালিকাও সংগৃহীত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্যই ছিল এতদিন ধরে চলে আসা সামাজিক নিরাপত্তা দান ব্যবস্থাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এতটা পরিমাণে দেয়া হত, যা তার জন্য যথেষ্ট হত। ইসলামী রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদনে এবং জিহাদে অগ্রবর্তিতার বৈশিষ্ট্যের দিকেও লক্ষ্য রাখা হত এবং সেদিক দিয়ে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুপাতে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি

---

১১৭ মুস্তাফা সিবাঈ, ইশতিরাকিয়াতুল ইসলাম, পৃ. ৩১৭

১১৮ আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ (বয়রুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

সদ্যজাত ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যও একশ দিরহাম করে নির্ধারিত করা হয়েছিল। তার বয়শঃ বাড়ার সাথে সাথে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে দু'শ দিরহাম করা হত। আর পূর্ণ বয়স্ক হলে বৃত্তির পরিবর্তন সে অনুপাতে বাড়িয়ে দেয়া হত।[১১৯]

হযরত 'উমর (রা.) একবার গরীব ও ফকীর লোকদের খাবার ব্যাপারে ভাতা নির্ধারণের সময় বেশ খেতে পারে এরূপ কয়েকজন লোককে ডেকে এনে দুবেলা খাওয়ান। অতঃপর সে পরিমাণ খোরাকি ভাত প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেন।[১২০]

হযরত 'উমর (রা.) একহাতে মুদ এবং অপর হাতে কুসত (ওযন বিশেষ) নিয়ে বলেছিলেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমি প্রতিমাসে দু'মুদ গম, দু'কুসত যয়তুনের তেল এবং দু'কুসত সিরকা নির্ধারণ করে দিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, দাসদের জন্যও কি তাই? হযরত 'উমর (রা.) বললেন হ্যাঁ দাসদের জন্যও।[১২১]

হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে এ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অমুসলিম নাগরিকদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। সিরিয়া সফরকালে হযরত 'উমর (রা.) দেখলেন, সরকারি কর্মচারিগণ জিযিয়া আদায় করার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত আছে: "সিরিয়া সফর থেকে ফিরার পথে হযরত 'উমর (রা.) একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদেরকে রোদে দাঁড় করে রেখে তাদের মাথায় তেল ঢালা হচ্ছিল। তিনি বললেন, এরা কারা? সরকারি কর্মচারিগণ বলল, এরা জিযিয়া দিচ্ছেনা জিযিয়া আদায়ের জন্য এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। 'উমর (রা.) তাদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।"[১২২]

দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত উমর (রা.) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারী করেছিলেন। বর্ণিত আছে, "হযরত উমর ফারুক (রাঃ) দামেস্ক যাত্রাকালে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক খৃস্টান

---

১১৯ আবূ 'উবায়দা, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২২৭

১২০ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, LUGDUNI BATAVORUM, E.J. BRILL. 1968, পৃ. ৪৪২

১২১ কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৪৬ এবং ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৪৭

১২২

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم قد اقيموا في الشمس يصل على رؤسهم الزيت فقال : ما بال هؤلاء؟ فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها فقال عمر : فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا : يقولون لا نجد قال : فدعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تعذبوا الناس فان الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة وأمر بهم فخلى سبيلهم- কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে সাদকার ফান্ড থেকে অর্থ দান করার এবং খাদ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[১২৩]

এ ব্যাপারে তিনি কুর'আন মাজীদের আয়াত উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে, ''সাদাকা কেবল ফকীর ও মিসকীনদের জন্য"[১২৪] এবং তিনি বলেছেন আয়াতে ফকীর' বলতে নিঃস্ব মুসলিমগণকে বোঝানো হয়েছে আর 'মিসকীন' বরতে অমুসলিম গরীবদের বোঝানো হয়েছে।[১২৫]

ইসলামে অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল নিম্নের ঘটনাটিঃ

হযরত 'উমর (রা.) এ কথার শেষাংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সরকার ধনশালীদের নিকট থেকে কর, রাজস্ব ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় করবে, যুবশক্তিকে জাতীয় কাজে নিযুক্ত করবে এটা দেশবাসীর সরকারের স্বাভাবিক অধিকার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে, তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকার গ্রহণ করতে হবে। এটা রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার, এটাও যথাযথ পূর্ণ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। ইসলামী অর্থনীতির এ বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। দুনিয়ার পুঁজিবাদ অন্যান্য অর্থনীতিতে শুধু সরকারি কর্মচারিদের জন্য বেতনের একটা সামান্য অংশ পেনশন বাবদ জমা করার ব্যবস্থা করা হয় বটে; কিন্তু তাতে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় কিনা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র হয় না, তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় না। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এ কথা দ্বারা হযরত 'উমর (রা.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, লোকটি অমুসলিম আহলে কিতাব হলেও আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী বায়তুল মাল থেকে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। অতএব তাকে বায়তুল মাল থেকে সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বায়তুলমালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খলীফার এ নির্দেশ অনুসরণ করে লোকটির জন্য মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন এবং তার উপর ধার্য জিযিয়া রহিত করেন।

এ সময়েই আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য। হযরত বিলাল (রা.) খলীফার নিকট স্থানীয় প্রশাসক সেনানায়কদের উপেক্ষার দরুন সৃষ্ট দরিদ্র জনগণের অভাব-অনটন সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এ সময় খলীফা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আল্লাহর নামে শপথ। এ আসন থেকে আমার কাছ থেকে যাওয়ার

---

১২৩ ان عمر بن الخطاب عند مقدمه الجابية من ارض دمشق مر بقوم مجذمين من النصارى فامر ان يعطوا من الصدقات و ان يجرى عليهم القوت- আল-বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ. ১২৯

১২৪ انما الصدقات للفقراء والمساكين আল-কুর'আন, ০৯ : ৬০

১২৫ কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

আগেই তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রতিটি অভাবগ্রস্ত নাগরিকের জন্য দু'মদ পরিমাণ আটা ও খাবার অনুপাতে প্রয়োজন পরিমাণ সিরকা ও খাবার তেলের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

হযরত 'উমর (রা.) খিলাফতের অর্থনৈতিক আদর্শ পর্যায়ে ঘোষণা দিয়েছেন, "আল্লাহর কসম! রাষ্ট্রীয় সম্পদে কোন লোকই অপর কারো তুলনায় অধিক পাওয়ার অধিকারী নয়। আমিও কারো অপেক্ষা বেশী অধিকার সম্পন্ন নই। আল্লাহর নামে শপথ! এ সম্পদে প্রত্যেকটি মুসলিমগণের-ই প্রাপ্য অংশ রয়েছে আল্লাহর কসম! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সান'আর রাখালকেও এ সম্পদ থেকে তার অংশ অবশ্যই প্রদান করব। অথচ সে তার নিজের স্থানে পশু-পালনের কাজে ব্যস্ত থাকবে।"[১১৬]

হযরত 'উমর (রা.) র এ হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী বলেছেন, এ হাদীসই দলীল যে, মুসলিম জাহানের শাসক সাধারণ মানুষের মতই। এ ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে তার বেশি মর্যাদা নেই। গনীমতের সম্পদ প্রভৃতি থেকে তাকে আগে অথবা বেশি দেয়া যায় না। এমনিভাবে এ হাদীস এ কথারও দলীল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়ার অধীনে প্রত্যেক মানুষ সে যতদূরেই থাকুক না কেন এবং তার শান যত ছোটই হোক না কেন সে সামষ্টিক সম্পদ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার হক ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার অংশ পেয়ে যাবে।[১১৭]

ফারূকে আযম (রা.) হযরত খালিদকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'এ ধন মাল সরকারি ব্যবস্থাধীন। তা একান্ত ভাবে গরীব জনগনের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।'[১১৮]

হযরত 'উমর (রা.) জনগণের প্রয়োজন পূরণে দায়িত্ব কত তীব্রভাবে অনুভব করতেন তা তাঁর নিম্নোক্ত কথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ঃ "ফোরাত নদীর তীরে একটি ছাগী ও যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে, তাহলেও 'উমরের ভয় হচ্ছে, আল্লাহ হয়ত তার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন, ছাগীটির চলার পথ কেন সমতল করনি?"[১১৯]

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা.) এর সময়েও সামাজিক নিরাপত্তা দানের এ ইসলামী ব্যবস্থা সর্বোতভাবে অব্যাহত ছিল। তাঁর খিলাফতকালে ব্যাপক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং উথাল-পাতাল অবস্থা

---

[১১৬] ما احد احق بهذا المال من احد وما انا احق به من احد والله ما من المسلمين احد الا وله فى هذا المال نصيب ووالله لئن بقيت لهم لاوتين الر اعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو ير عى مكانه মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৪২

[১১৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার* (বয়রুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩), খ. ২, পৃ. ৭৯

[১১৮] আলী ইবন আবু বকর আল হায়ছামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ* (কায়রো: মাকতাবা আল-কুদস, ১৩৫২ হি.), কিতাবুল মানাকিব, পৃ. ৩৪৯

[১১৯] لو عثرت شاة على شط الفر ات لخشى عمر ان يحاسبه الله عنها لم لم يمهد لها الطريق. *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বিমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

থাকা সত্ত্বেও বায়তুলমালে যাকাত-সাদাকাত জমা হওয়া অব্যাহত থাকে এবং জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোন কোন বর্ণনায় তো এতদূর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তখন জনগণের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা এতই সচ্ছল ছিল, যাকাত গ্রহণ করার মত লোকই পাওয়া যেত না। তা সত্ত্বেও তিনি সকল শাসনকর্তার প্রতি এ ফরমান পাঠিয়েছিলেনঃ "জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা শাসকদের রাখালের ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে শুধু কর আদায়কারী হতে তিনি কখনই বলে পাঠাননি। মনে রেখ, অতীব উত্তম, ন্যায়বাদী, সুবিচারকারী চরিত্র হচ্ছে মুসলিম জনগণের যাবতীয় সমস্যার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। তাদের নিকট থেকে যা গ্রহণীয় এবং তাদের প্রতি যা দেয় তা সঠিকভাবে গ্রহণ করবে ও দেবে। তারপরে যিম্মীদের প্রতিও তোমাদের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। তাদের যা কিছু প্রাপ্য তাদের দেবে এবং তাদের যা দেয়, তাও তাদের নিকট থেকে নিয়ে নেবে।"[১৩০]

খারাজ আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারিদের প্রতি তিনি স্বতন্ত্রভাবে এ ফরমান পাঠান: "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টলোককে পরম সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি সত্য ও সত্যতা ছাড়া আর কিছুই কবুল করেন না। অতএব সত্যতা সহকারে যা প্রাপ্য, তা গ্রহণ কর এবং যা দেয়, তা যথারীতি আদায় কর। আমানতের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমরাই আমানত লোপাটকারী প্রথমব্যক্তি হয়ে দাড়িও না। তাহলে তোমাদের এ পাপ উপার্জন তোমাদের পরবর্তী লোকেরাও শরীক হয়ে পড়বে। ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সাবধান, ইয়াতীম অসহায়ের উপর কখনই যুলম করবে না। সন্ধি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কেননা কিয়ামতের দিন মযলুমদের পক্ষে প্রধান বিবাদী হবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা।"হযরত 'উসমান (রা.) খিয়ারে নাহদীর বার্ধক্য ও অধিক সন্তান-সন্তুতি দেখে তাদের সংখ্যা সম্পদের খবরাখবর নেন। অতঃপর তিনি খিয়ারে নাহদী ও তার সন্তানদের পৃথক পৃথক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[১৩১]

'উমর ইবন আবদুল আযীয খলীফা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে কত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর উপরিউক্ত ভাষণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুত ইসলাম যে রাষ্ট্রপ্রধানের উপরই সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ ও অকাট্য প্রমাণ।

হযরত 'উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদী ইবন আরতাতকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "তুমি নিজে লক্ষ্য করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ এবং

---

১৩০ فان الله امر الا ئمة ان يكونوا ر عاة ولم يتقدم اليهم بامر هم ان يكونوا جباة الا وان يكونوا جباة الا وان اعدل السيرة ان تنظر وافى امور المسلمين وفيما عليهم فتعطو هم بما عليهم ثم تثلوا باهل الذمة فتعطو هم الذى لهم وتاخذو هم بالذى عليهم- আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলূক*, ব্রীল, ১৯৬৪ , খ. ২, পৃ. ৩৬০

১৩১ *কিতাবুল আমওয়াল*, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের দাও।"[১৩২]

হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিযাম দেখলেন, সরকারি কর্মচারি আয়ায ইবন গানাম জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দেবে, তারা পরকালে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।"[১৩৩]

আধুনিক শিল্প সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হল 'সামাজিক নিরাপত্তা'। আধুনিক সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত সামাজিক নিরাপত্তা অতীতে না থাকলেও সামাজিক নিরাপত্তার ধারনা মানব সমাজে স্মরনাতীত কাল থেকে প্রচলিত ছিল।সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাস সমাজকল্যাণের মতই সুপ্রাচীন। সকল সমাজেই নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য কোন না কোন নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল। আদিম মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলত। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে, আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হত।

বস্তুত প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রাক শিল্প যুগে আধুনিক শিল্প সমাজের ন্যায় মানুষের জীবনে সাধারণ ঝুঁকি তেমন ছিলনা। ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা চালানো হত। জীবনের সাধারণ ঝুকি কম থাকায় প্রাক শিল্প সমাজে মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলনা। সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যৌথ পরিবারই ছিল সামাজিক নিরাপত্তা'র মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ সামাজিক নিরাপত্তা'র ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের আস্তানা ও আশ্রমে লঙ্গরখানা , ইয়াতীমখানা, সরাইখানা প্রভৃতির মাধ্যমে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করত।

প্রাক-শিল্প যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় রাজাগণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে জনসেবা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রজাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতেন। এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল সাময়িক এবং বিচ্ছিন্ন ও অপরিকল্পিত।

শিল্প বিপ্লবের ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে যে বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে তা সামাজিক নিরাপত্তা'র প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তোলে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা,

---

১৩২ انظر من قبلك من اهل الذمة قد كبرت سنه و ضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه
আল কাসিম ইবন সালাম আবূ উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

১৩৩ ان الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبون فى الأخرة কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক ভাঙ্গন, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত দুর্ঘটনা প্রভৃতি দেখা দেয়। এসব সমস্যা মোকাবেলার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সুসংহত ও সুপরিকল্পিত সামাজিক নরাপত্তা রাষ্টীয় পর্যায়ে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাষ্টীয় পর্যায়ে সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুচনা করেন জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক (Otto Von Bissmark) ১৮৮৩ সালে। ১৮৮০ সালের মধ্যে তিনি সামাজিক বিমা (Social Insuranc) সম্পর্কিত কতিপয় আইন প্রনয়ন করেন। ১৮৮৩ সালে জার্মানিতে প্রথম বাধ্যতামূলক Insurance Act প্রণীত হয়। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি অন্যান্য দেশে গৃহীত হয়।[২৮]

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সেখানে 'সামাজিক নিরাপত্তার' নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে ," The each according to his capacity, to each according to his need." অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তাদের সামর্থ ও সুযোগ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার কাজের মান বা পরিমাণ যাই হোক না কেন বিনিময়ে রাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় জীবিকার সংস্থান করবে।' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আহার, বাসস্থান ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে।

অন্য একটি মত অনুযায়ী আধুনিক সমাজে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র সূত্রপাত মূলত ইংল্যান্ডে। বর্তমান 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচির বীজ রোপিত হয় ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে রাজা অষ্টম হেনরী কতৃক দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণার্থে আইন প্রনয়ণের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে যে সকল আইন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রাখে তার মধ্যে ১৫৬২, ১৫৬৩, ১৫৭২, ১৫৯৭ সালের দরিদ্র আইন সমূহ উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত ভবঘুরেদের বেকারত্ব ও দরিদ্রতা রোধের জন্য যে সকল আইন প্রনয়ন করা হয়েছিল, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষার্থে এ আইনগুলোকে একত্রিত করে ১৬০১ সালে বিখ্যাত 'Poor Law' পার্লামেন্টে পাশ করা হয়। এ আইনানুসারে তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয় ঃ (ক) সক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি (খ) অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি (গ) নির্ভরশীল বালক বালিকা ও শিশু। সক্ষম পুরুষদের কাজ দেয়া হত। অক্ষম ব্যক্তিদের থাকার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে (Alms House) পাঠানো হত এবং ভরণ পোষণে অক্ষম পিতা-মাতা কিংবা পিতামহ নির্ভরশীল সন্তানদিগকে বিনা বেতনে কেবল ভরণ- পোষণের শর্তে কারও নিকট শিক্ষানবীশ হিসেবে (Apprentice) রাখা হত। তারা বালক হলে ২৪ বছর পর্যন্ত এবং বালিকা হলে বিবাহকাল পর্যন্ত সেখানে থাকত। এ তিন প্রকার সাহায্যের জন্য সে এলাকার জমি, বাড়ি এবং পুরোহিতদের আয়ের দশমাংশের উপর কর বসিয়ে অর্থগমের ব্যবস্থা করা হত। তদুপরি এ অর্থের সহিত স্থানীয় বেসরকারি দান ও আইন অমান্যকারী ব্যক্তিদের জরিমানার অর্থও যোগ করা হত। কিন্তু এতে অবস্থার বেশী উন্নতি হল না। সাহায্যপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা না কমে দিনের পর দিন আরও বাড়তে লাগল। সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য Poor Law এর সহিত আরও একটি ব্যবস্থা চালু করা হল যাকে 'ওয়ার্ক হউস টেষ্ট' (যেখানে কাজ দিয়ে দরিদ্রদেরকে প্রতিপালন করা হয়) বলা হয়। এখানে লোককে কাজ দেয়া হত, কাজ করতে অস্বীকার করলে জেলে পাঠানো হত ও সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হত। ক্রমে এ ব্যবস্থায় মানুষের দুর্গতি বেড়ে যায়। অবশেষে

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮১ সালে পার্লামেন্ট এ রীতি বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত Poor Law প্রচলিত থাকলেও এ দু'শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বহু পরিবর্তন ঘটে যথা, সমাজতন্ত্রের অবসান, চার্চের অবাধ অধিকার সংকোচন এবং বানিজ্য ও শিল্পের প্রবর্তন। এ পরিবর্তনে সমাজে বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয় এবং এ সবের প্রতিবিধানার্থে ১৮৩৪ সালে পার্লামেন্ট সদস্যদের দ্বারা গঠিত কমিশন Poor Law এর রদবদলের জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট মোতাবেক তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল ঃ (ক) অতি কমপক্ষে কি ধরনের লোক সাহায্য পাবার যোগ্য তার মান নির্ণয় (খ) 'ওয়ার্ক হাউজ টেষ্টের' পুনঃপ্রবর্তন এবং (গ) সাহায্য সম্বন্ধীয় সব রকম ব্যবস্থা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনাধীনে আনয়ণ করা।[৩০]

১৮৩৪ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত Poor Law এর অনেক রদবদল হয়;এ রদবদলের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেনীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। যেমন, ভরণ-পোষণে অক্ষম পিতা-মাতার সন্তানদের স্কুলে কিংবা পালক পিতা-মাতার নিকট রাখার ব্যবস্থা, অসুস্থ ও আতুরদের জন্য চিকিৎসালয়, উন্মাদ ও অর্ধ-উম্মাদদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান; অন্ধ, বোবা, বধিরদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা। কিন্তু এসব ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে অবস্থার উন্নতি সাধনে সামর্থ হল না। ১৯০৯ সাল থেকে মানুষকে সমাজে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রনয়ণ শুরু হয়। ১৯১১ সালে 'জাতীয় বিমা আইন' বা National Insurance Act পাশ হয়। এ আইনানুসারে মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধীকারী এবং সাময়িকভাবে নাবালক সন্তানদের নগদ অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৫ সালে বিধাবা, অনাথ ও বৃদ্ধাবস্থায় পেনশন পাবার আইন (Widows, Orphans and Old Age Contributor y Pension Act) পাশ হয়। এরপর ১৯৩৪ সালে বেকার ভাতা আইন পাশ হয়। সামাজিক বিমা ও সংশ্লিষ্ট সাহায্যের আন্তবিভাগীয় কমিটির সভাপতি (Chairman of the Inter-Department Committee oF Social Insurance and Allied Services) স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ১৯৪২ সালে ২০ শে নভেম্বর সরকারের নিকট তাঁর বিখ্যাত রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি এবং তাঁর কমিটি প্রচলিত জাতীয় কর্মসূচী, সামাজিক বীমা-পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট সাহায্য ব্যবস্থার উপর জরিপ করে এ রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর রিপোর্টের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান সুপারিশ হল প্রচলিত সকল বিমাগুলোকে জাতীয় বিমা (National Insurance) নামে একটি বিমার অধীনে নিয়ে আসা। ১৯৪৫ সাল থেকে বেভারিজের অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সাল থেকে 'ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট' ইংলান্ডে পরোদমে চালু হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডে যে সাহায্যকারী ব্যবস্থা চালু রয়েছে(ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট বাদে) তা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ (ক) পারিবারিক সাহায্য(family allowance)। (খ) জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (national health service)। এবং (গ) জাতীয় সাহায্য (national assistance) 'পারিবারিক সাহায্য' ব্যবস্থার প্রধান কথা হল, প্রথম সন্তানের পর অন্যান্য সন্তানের বেলায় পিতা-মাতা মাথাপিছু পাঁচ শিলিং করে পাবে। 'জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায়' ইংলান্ডে প্রতিটি নাগরিকের দন্তরোগ ও অন্যান্য অসুখে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এর সমস্ত খরচ নাগরিকের দেয়া কর থেকে আসে। 'জাতীয় সাহায্য' ব্যবস্থায় যারা জাতীয় বিমার আওতায় পড়েনা তাদের সাহায্য করা হয়ে থাকে। [৩১]

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার 'সামাজিক নিরাপত্তা'র মূল হল ইংল্যান্ডের Poor Law। আমেরিকায় প্রথম এসে যারা উপনিবেশ স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই বৃটিশ। বৃটিশরা আমেরিকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে করে এনেছিল ইংলিশ আইন, প্রতিষ্ঠানের ধারণা ও জীবন যাপনের রীতিনীতি। সুতরাং মানুষের সাহায্য দানের ক্ষেত্রেও সে রীতি-নীতি ও ধারণার অনুসরণ করা হল। সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হল Alms House। তখন সকলে এ ধারণা পোষণ করত যে, অপরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা একটি অসম্মানজনক ব্যাপার। সুতরাং সাহায্য ব্যাপারটি যতদুর সম্ভব বিস্বাদ(unpalatable) করে তোলা আবশ্যক, নইলে অপরের সাহায্যের উপরই এরা নির্ভর করবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহায্য দানের একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র Alms House কে নারকীয় বীভৎসতায় ভরে তোলা হয়েছিল। বৃদ্ধ, যুবা, সুস্থ-অসুস্থ, উন্মাদ, অর্ধ-উন্মাদ, মানসিক বিকারগ্রস্ত অন্ধ, মাতাল সকলকে একসঙ্গে পশুর মত সেখানে রাখা হত। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র (State) গঠনের সূচনায় দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যদান পদ্ধতি উপরে বর্ণিত রীতির মধ্য দিয়েই পরিচালিত হত। কিন্তু অচিরেই তারা উপলব্ধি করতে পারল যে সাহায্য দানের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন এবং এ অর্থ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ সম্ভব নয়। এছাড়া বিশেষ শ্রেণীর (যেমন অন্ধ, বোবা প্রভৃতি) স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে ১৭৭৩ সনে ভার্জিনিয়াতে 'উন্মাদ হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ১৮৮২ সালে কেনটাকিতে'বোবা-কালাদের প্রতিষ্ঠান' ও ১৮৪৮ সালে মেসাচুসেটস্-এ অপরাধপ্রবণ কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। স্থানীয় সাহায্যের সহিত রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। রাষ্ট্র যখন কতগুলো বিশেষ শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করল তখন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মেসাচুসেটস্ এ State-Wide Organisation নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, এবং পরে ১৮৬৩ সালে Board of Charities নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অতঃপর এ প্রতিষ্ঠান সাহায্যদান ও বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করতো। কিন্তু এ বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং তার কর্ম পরিচালনার মধ্যে সাহায্যদান সম্বন্ধে কোনরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেনি। তিন শতাব্দীর এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয় ১৯১৭ সাল থেকে। তারা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে যে, যারা সামাজিক নানা বাধায় অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত এরা যদি বাধগুলো অপসারণ করবার মত সাহায্য পায় তবে সমাজে একজন উপযুক্ত মানুষ বলে গণ্য হতে পারে। এ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সন থেকে ১৯২৯ সন পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ষ্টেটে রিবাট আন্দোলন গড়ে উঠে। ফলে সমাজকল্যাণমূলক কাজ শুধু ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না ফেডারেল গভর্ণমেন্টকেও এতে অংশ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হল, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২৯ সনে যে বিরাট মন্দা (Great Deperssion) নেমে আসে তাতে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন ও বেকার হয়ে পড়ে। অনাহার, অসুস্থতা, নিরাশা মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কিন্তু এবার আর তারা Poor Law নীতির দিকে ফিরে গেলনা নতুনভাবে এ সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত বেকারলোকের সংখ্যা দাড়াল ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এ বিরাট সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো গঠিত হল তার মধ্যে প্রধান ছিল (ক) ইমারজেন্সি রিলিফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, (খ) ফেডারেল ইমারজেন্সি রিলিফ ট্রাষ্ট, (গ) ওয়ার্ক প্রোগ্রেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, (ঘ) সিভিলিয়ান কনজারভেশন কোর এবং ন্যাশনাল ইউথ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। মানুষকে সাহায্য করার ঐকান্তিক

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা ও ইচ্ছার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উপলব্ধি পরিস্ফুট হয়ে উঠল-(ক) জনসেবা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা, (খ) সমাজ-সেবা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল এ ধারণা, (গ) বেকার সমস্যা, বার্ধক্য, অসুস্থতা, কর্মক্ষমতা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। এ উপলব্ধি থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজবেল্ট ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন (Social Security Act) পাশ করেন। এর তিনটি বিভাগঃ (ক) সামজিক বিমা (Social Insurance) (খ) সরকারী সাহায্য (Public Assistance), (গ) স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণ। শেষোক্ত বিভাগটি বিশেষভাবে জোর দেয় শিশুকল্যাণের ওপর। আর 'সামাজিক বিমা আইন'সমস্ত আমেরিকাকে জনকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।[৩২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯২৯ সালের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকবেলায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজবেল্ট ১৯৩৫ সালে 'সামাজিক নিরাপত্তা' আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক 'সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ড উইলিয়াম বেভারিজ প্রদত্ত্ব 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচীর রূপরেখা' সামাজিক নিরাপত্তা'র ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। শুধু ইংলাণ্ডেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচির আদর্শ হিসেবে বেভারিজ রিপোর্ট কে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরপর থেকে বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সব দেশেই জনকল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সুপরিকল্পিত 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রাচীন উদ্দ্যোগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানের ন্যায় সংগঠিত না হলেও প্রাচীন সমাজে সীমিত আকারে সামাজিক নিরাপত্তার প্রচলন ছিল। আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন উদ্দ্যোগ সমূহে কোন স্থায়ী ও স্বীকৃত নিরাপত্তা ছিল না। প্রজাহিতৈষী শাসক এবং ধর্মীয় উদ্দ্যোগে পরিচালিত জনকল্যাণ ও সামাজসেবামূলক কর্মসূচি সমূহের মাধ্যমে দুঃস্ত, আর্ত ও অসাহায় জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালানো হত। নিম্নে প্রাচীন ভারত, গ্রীস, রোম, চীন ও আরবের (খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল) সমাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলঃ

প্রাচীন ভারতে সমাজিক নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

সুদূর অতীত থেকে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন যুগ ধরা হয়। প্রাচীন ভারতে সাধারণত হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কাজেই বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচীর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং প্রজাহিতৈষী শাসকদের উদ্দোগে পরিচালিত হত।

বৌদ্ধের অনুশাসন সম্বলিত জাটকা (Jataka) হতে সামাজিক নিরপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দ্যোগসমূহের কথা জানা যায়। যেমন:

১. শহরবাসীগণ তাদের চাঁদা ও দান একত্রিত করে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি সময় দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করত।
২. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য ও শিক্ষা প্রদান করা হত।
৩. বিভিন্ন ধর্মীয় পার্বণ ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হত। হিন্দু ধর্মেও সমাজকল্যাণ মূলক কাজের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ভগবত-গীতায়(ধর্মগ্রন্থ) দেশ-কাল-পাত্র ভেদে দানশীলতাকে সবচেয়ে উত্তম কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে দানশীলতাকে 'অর্থদান,' 'অভয়দান' এবং বিদ্যাদান' এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে শাসক, ব্যবসায়ী ও সচ্ছল ব্যক্তিরা ঐ সকল ক্ষেত্রে দানের প্রতিযোগিতা করত।

প্রাচীন ভারতের শাসকবর্গ কর্তৃক দুঃস্থ আর্তমানবতার সেবা সহ অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হক। শাসকবর্গ কর্তৃক গৃহিত এ সকল পদক্ষেপ আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার 'সামাজিক সাহায্য' (Social Assistance) ও সামজিক সেবার (Social Services) আওতাভুক্ত। নিম্নে এ ধরনের কতিপয় দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা হল:

ক. খ্রিষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগদের সিংহাসনে আরোহন করেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস এর বিবরণ থেকে জানা যায়, জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য তিনি গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। জনকল্যাণের জন্য তিনি রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, দাতব্যচিকিৎসালয়সহ বহু কল্যাণমূলক কাজ করেন।

খ. মহান অশোক জনগণের কল্যাণে রাস্তাঘাট নির্মাণ, সরাইখানা স্থাপন, কূপখনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, বৃক্ষ রোপণ, চিকিৎসামূলক ঔষধি রোপণ, পরিকল্পিত শিক্ষাদান পদ্ধতিসহ বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জনগণের কল্যাণে হাসপাতাল ও বিশ্রামাগার স্থাপন, দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা, ঔষধ ও পথ্যাদি সরবরাহ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. হর্ষবর্ধন জনগণের কল্যাণে পান্থশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার স্থাপন সহ দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগণকে অকাতরে দান করতেন।

ঙ. প্রাচীন ভারতে জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কাজে বাংলার শাসক রাজা ধর্মপালের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনগণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহারে ১০৭ টি মন্দির ছিল যেখানে ২১৪ জন অধ্যাপক শিক্ষাবিস্তারে নিয়োজিত ছিল। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি দৃশ্যমান হচ্ছে তা হল-প্রাচীন ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে আধুনিককালের সামাজিক বিমা (Social Insurance) কর্মসূচির অস্তিত্ব ছিল না এছাড়া 'সামাজিক সাহায্য ও সমাজসেবা' আধুনিক কালের ন্যায় সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। কারণ তখন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিল রাজতান্ত্রিক। ফলে এসকল কর্মসূচি শাসকবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল ছিল।[৩৩]

প্রাচীন গ্রীসে সামাজিক নিরাপত্তা

প্রাচীন মানব সভ্যতার মধ্যে, গ্রীক সভ্যতা সবচেয়ে উন্নত থাকা সত্ত্বেও সেখানে দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। দাস প্রথার ভিত্তিতেই গ্রীসে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত। অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও দাসদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। নির্মম অমানবিক কুশীদ[৩৪] প্রথার শিকার হয়ে কৃষক ও দিনমজুরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। এতে সম্পদশালী আরো সম্পদশালী হয়ে উঠে। পরবর্তিতে, সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লেটো-র প্রচেষ্টায়, গ্রীক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত এবং সেখানে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। এসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজা প্যারিক্লিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলে দরিদ্রের চিত্তবিনোদনের সুযোগদান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে দরিদ্রদের মাঝে অর্থ বিতরণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য, আহত সৈনিক ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, দরিদ্রকর ধার্য ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

গ্রীসের সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার পরিচয় আ.এ.স্কিডমোর এবং এম.জি.থ্যাকারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাঁরা ' Introduction of social Work ' গ্রন্থে বলেছেন, গ্রীকদের নিয়মিত দান সংগঠন না থাকলেও অসহায় পীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। সামাজিক পদ প্রার্থীরা বৃহৎ উৎসবের সময় প্রকাশ্যে দরিদ্রদের মাঝে দান ও সাহায্য বিতরণ করতেন। আহত সৈন্য ও শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ও দুঃস্থ

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য দরিদ্রকর ধার্য ও সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং দেখা যায় প্রাচীন গ্রীসে বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তার সঙ্গে আহত সৈনিক ও শিশুদের জন্য সংগঠিত নিরাপত্তাদানের সীমিত ব্যবস্থাও ছিল।[৩৫]

প্রাচীন রোমে সামাজিক নিরাপত্তা

প্রাচীন রোমের সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচী অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত ছিল। প্রাচীন রোমের শাসন ব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক থাকা সত্ত্বেও সম্রাটগণ শাসনকার্যে জনস্বার্থকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। রোমান সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। দাসরা প্রাথমিক যুগে মানবেতর জীবন যাপন করলেও শেষের দিকে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কারণ তখন রোমান সমাজে স্টোইসিজম (Stoicism) এর প্রভাব বৃদ্ধি পায় এ দর্শনে দানশীলতা, পরোপকার এবং মানুষের সামাজিক ও চারিত্রিক মান বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সম্রাট আর.লিয়াস উক্ত দর্শন মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তার আমলে গৃহীত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

(ক) দরিদ্র জনগণের কর লাঘব (খ) কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিত ও শাস্তির মেয়াদ হ্রাস (গ) অপরাধ প্রবণদের চরিত্র সংশোধনে সামাজিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দান (ঘ) শিক্ষার ব্যয়ভার রাজকীয় তহবিল থেকে বহন করা (ঙ) সম্পদের সুষম বন্টনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন।

প্রাচীন রোমে পরিবারকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এতে কোন দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি জীবন ধারণে অক্ষম হলে কোন সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট নিজেকে সমর্পণ করত। ফলে সম্পদশালী ব্যক্তি তার ও পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার বহন করত। এছাড়া পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হত। প্রাচীন রোমে শস্য বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে খাদ্য শস্য সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হত। এছাড়া দুঃস্থদের সেবা যত্নের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রের নিদর্শনও প্রাচীন রোমে পাওয়া যায়।

রোমের আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল উন্নত ও নিরপেক্ষ। ফলে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হত না। জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে আইন ও বিচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্রাট ভেস পার্সিয়নের আমলে হাসপাতাল ও চিকিৎসাবিদ্যা প্রসিদ্ধ লাভ করে, যা রোমানদের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।[৩৬]

উল্লেখ্য, প্রাচীন রোমে দাস বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তার প্রভাবে দাস ও নিম্ন শ্রেণীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীন চীনে সামাজিক নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন চীনা সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত ছিল। রাষ্ট্র এবং সামন্ত প্রভূরা নিজ নিজ স্বার্থে ভূমি ব্যবহার করত। কৃষক শ্রেণী ভূমি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষতার অধিকারী। সম্পদশালী শ্রেণী বিলাস-বহুল ও আরামদায়ক চজীবন যাপন করলেও কৃষক, শিল্পী, মিস্ত্রী, মালী প্রভৃতি শ্রেণী দরিদ্র সীমার নিচে জীবন যাপন করত। রাজাদের ইচ্ছার উপর জনসাধারণের নিরাপত্তা নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন চীনে যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রচলিত ছিল James H.S. Bossard এর বিবরণ হতে তা ফুটে উঠে। বোসার্ডের বিবরণ অনুযায়ী প্রাচীন চীনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম প্রচলিত ছিল:

ক) বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দরিদ্রদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলা।

খ) দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল।

গ) পরিশ্রান্ত শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ।

ঘ) পুরানো বস্ত্র বিতরণ, বিয়ের খরচ বহন এবং দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থদের খবর দেয়ার সংগঠন ছিল।

ওয়েনি ভেসির বিবরণ হতে জানা যায় যে, প্রাচীন চীনে বৃদ্ধ ও অসুস্থ দরিদ্রদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র এবং দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং দেখা যায়, প্রাচীন চীনে রাজতন্ত্র ও সামন্ত প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও দুঃস্থ, দরিদ্র ও অক্ষম প্রভৃতি শ্রেণীর কল্যাণে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যেগুলো তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে, জনগণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খোলাফায়ে রাশিদার আমল

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময় মদীনা রাষ্ট্রে খুলাফোয়ে রাশিদীনের আমলে এবং তাদের পরবর্তীতে উমাইয়া খলীফা 'উমর ইবন আব্দুল আযীযের সময় সামাজিক নিরাপত্তা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল।
এভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ থাকলেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় যে সামাজিক নিরাপত্তা ছিল তা আজও বিশ্বে বাস্তবায়িত হয়নি। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এসবের উপর ভিত্তি করে তাঁরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং সাম্যের সুমহান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেসব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে যেসব নিরাপত্তমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল আলোচ্য গবেষণায় তারই বিস্তারিত রূপ উপস্থাপন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশ্বজনীন মানবতাবাদ,সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি

ইসলামী সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশ্বজনীন যে মানবতাবাদ, সাম্য, ভ্রাতৃত্বনীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে মানব কল্যান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এখানে আলোকপাত করা হলো।

সামাজিক নিরাপত্তা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভূক্ত। কেবল দুঃস্থ, অসহায় ও অক্ষম লোকদের নিরাপত্তা বিধানই নয়, আকস্মিক বিপদ থেকে সক্ষম ও সচ্ছল লোকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করাও সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। আজকের বিশ্বে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র যে ধারণা বিদ্যমান এর সাথে মানবতার ধর্ম ইসলাম সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসিকে পরিচয় করিয়েছে। যথার্থ অর্থে মানব ইতিহাসে মহানবী (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রেই 'সামাজিক নিরাপত্তা'র বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এর সুফল নানাভাবে ভোগ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয় 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ধারণা মুসলিমদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কালক্রমে মুসলিমগণ 'সামাজিক নিরাপত্তা'র জন্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে হাত বাড়িয়েছে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করতে গিয়ে তারা অসংখ্য সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য তাদেরকে ইসলামের মহান আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয়া যাতে করে তাঁরা ইসলাম ঘোষিত 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ধারণাকে পূর্বের ন্যায় বাস্তবায়ন করে বিশ্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাতে পারেন। পাশাপাশি তথাকথিত পশ্চিমাবিশ্ব যারা নিজেদেরকে 'সামাজিক নিরাপত্তা'র ব্যবস্থার জন্মদাতা বলে দাবি করে তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া যে, তাদের এ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার কয়েকশ বছর পূর্বেই ইসলাম এ ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং ইসলামের সোনালী যুগে মহান খলীফাগণ তাঁদের স্ব স্ব রাষ্ট্রে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষ। সে একাধারে আত্মিক, বুদ্ধিভিত্তিক, নৈতিক, জৈবিক ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে জীব। মানব এককে আত্মা, মন, নৈতিক চেতনা, যৌন তাড়না, বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা, দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিনয়, অহমিকা, আবেগ, ক্রোধ-উত্তেজনা, রাগ-অনুরাগ ইত্যাদি বিদ্যমান। এসব উপাদানের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার অবস্থান শীর্ষে। আত্মার অনুপস্থিতিতে মানব অবয়ব লাশ বা পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিশোধিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত আত্মা যথার্থ মানবিক অভিপ্রায়কে জাগ্রত করে। আর জাগ্রত মানবিক অভিপ্রায় যখন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিব্যাপ্ত হবে তখনই সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা সম্বলিত সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জীবন দর্শন এবং এর সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বলয়ে আত্মিক দিক নির্বাসিত। আগামী ৫০ বছরের শ্রেষ্ঠতম উন্নতি-সমৃদ্ধি কোন ধরনের গবেষণার উপর নির্ভরশীল? এ প্রশ্নের উত্তরে ড. চার্লস ষ্টেইনমেজ (Dr. Charles Steinmetz) বলেন, "আমি মনে করি সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে। একদিন মানুষ বোঝাতে পারবে যে, বস্তুগত জিনিস মানুষের সুখ-শান্তি আনেনা এবং এগুলো নর-নারীকে সৃজনশীল ও ক্ষমতাশালী করতে খুব কমই কাজে আসে। তখন বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাগার গুলোকে আল্লাহ, প্রার্থনা ও আধ্যাত্যিক চেতনার দিকে ঘুরিয়ে নেবে যার সম্পর্কে বর্তমানে খুব কমই আলোচিত হয়। তখন বিশ্ব এক প্রজন্মে অনেক সমৃদ্ধি দেখবে যা বিগত চার প্রজন্মে দেখেনি।"জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ন্যায় অর্থনীতিতে ও ইসলামের রয়েছে যথার্থ ভূমিকা। ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে যাকাত। যাকে আধুনিক কল্যাণ ভাষায় ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান (Social Security System of Islam) বলা বলতে দ্বিধা নেই, পাশ্চাত্যে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান তথা সমাজ কল্যাণ নীতির ফলপ্রসূ ও যথার্থ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নমুনা (Model) বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে, যখন এ পৃথিবী সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার নাম-নিশানাও ছিল না। যদি বৃটেনের রাণী এলিজাবেথের আমলের। Law-1601 কে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দৃষ্টান্ত হিসেবেও ধরা হয় তাহলে এরও এক হাজার বছর পূর্বে; আর যদি ১৮৮৩ সালে জার্মানীতে 'বিসমার্ক' সম্মেলনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য Accidental Insurance Act কে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া হয় তাহলে প্রায় ১২৫০ বছর আগেই যাকাত নামক সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম সফলতার সাথে রাষ্ট্রে প্রবর্তন করেছিল। এ প্রসঙ্গে খালিদ বলেন, "যা হোক ৬২২ খৃস্টাব্দ ছিল কল্যাণরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক মাইলফলক। এ বছর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

মানবতাবাদ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলামের কল্যাণকর ভূমিকার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন, "হে মানুষ! তোমরা বল আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ নেই, এ আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহলেই তোমরা কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে।"[১৩৪]

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। একজন মুসলিম আল্লাহ্ ও মানুষের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে শাস্ত্রমতে ইসলাম মানবতার আদর্শে প্রচারিত ও পালিত ধর্মও বটে। ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্র একত্ব ও মানবজাতির মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনকে গুরুত্ব দেয়। মানবতার স্বার্থে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, জন্মসূত্রে সব মানুষ স্বাধীন ও মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। ধনী-দরিদ্র সবাই মুসলিম হিসেবে এক মসজিদে এক সঙ্গে নামায আদায় করে এক আল্লাহ্র উপাসনা করে। এই আল্লাহ্ নিরাকার। এতে কারো কোনো পার্থক্য দেখা দেয় না। কোনো বাঁধা থাকেনা। আল্লাহ্র কাছে সব মানুষ ভাই ভাই। ইতিহাসের পাতায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত, শত্রুর প্রতি সেবামূলক আচরণের অনেক উদাহরণ মুসলিমগণের মাঝে পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা সালাউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয়ে শত্রুর তাঁবুতে চিকিৎসকের বেশে গিয়েছিলেন ও চিকিৎসা করে মানবকল্যাণে নজীর স্থাপন করে গেছেন।

মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মুসলিম ধনী ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ ধর্মীয় বিধান মতে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা আছে। মনুষের ভাগ্য জয় করার বা আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় হওয়ার পথ পাওয়ার জন্য ইসলাম মানুষকে সাহায্য করে। ইসলামের ইতিহাসে প্রভুর অর্থে ক্রীতদাস মুক্তি লাভ করে সিংহাসন লাভ করেছে, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছে এমন নজির আছে। ভারত ও মিশরের মামলুক শাসকরা নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষার জোরে বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে ধনী ও গরিবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। একের অর্থে অপরে উপকৃত হতে পারে। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে সবার জন্য সুযোগ প্রতিষ্ঠাকালে ইসলাম ধর্মে তাগিদ রয়েছে। ধনী ব্যক্তিদের সদকা বা দানের অর্থে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ও এতিমখানা পরিচালনার উদাহরণ আমাদের দেশে অনেক আছে। সৎপথে অর্জিত অর্থ ধর্মের নামে ব্যয় করা হলে পরকালে এর বিনিময় পাওয়া যাবে কিন্তু শুধু ইহকালিন নাম-যশ কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করলে নাম-যশ হতে পারে কিন্তু পরকালে উপকারে আসবে না। ইসলাম ধর্মে ধন অর্জন করার সুযোগ আছে, ধন লুটেরা হবার কোন সুযোগ নেই। ধনী ব্যক্তিকে যাকাত হিসেবে অর্জিত অর্থের সঞ্চিত অংশের ৪০ ভাগের এক ভাগ গরিব-মিসকিনের হাতে দিয়ে উপার্জনকে শুদ্ধ করার বিধান আছে এবং প্রয়োগ ব্যবস্থাও আছে আমাদের সমাজে। যে আয়ের যাকাত

---

[১৩৪] يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ৩, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

দিতে হবে এরুপ পরিমাণে পৌছার সীমাকে নিছাব বলে। অর্থাৎ কারো নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বা সম পরিমাণ অর্থ থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে। গচ্ছিত স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত ভরির সমান বা তার বেশি থাকে অথবা রূপা ৫২ তোলার সমান বা বেশি হয় তবে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে। ঘরে বা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা টাকার, ব্যবসায়ের সামগ্রীর জন্যও যাকাত দেয়ার বিধান আছে। ছাগল (৪০টি হলে), গরু(৩০ টি) ইত্যাদি পালিত পশুর জন্যও যাকাত দেওয়া প্রয়োজন। পানি সেচের জন্য যে ফসল উৎপাদন করা হয় তার ১০ ভাগের এক ভাগ ও অন্যান্য ফসল , ধান, ফলের জন্য ২০ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত দেওয়া হয়। কৃনিভূমি ও বসতবাড়ির জন্য যাকাত দিতে হয় না। বাড়ির ভাড়া হতে যে আয় হয় , সে আয়ের উদ্ধৃত্ত অংশের যাকাত দেওয়ার দরকার হয়। হাদীস শরিফে আছে যে, এতিমের হক ব্যাবসায় লাগালে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থের যাকাত দেওয়া প্রয়োজন।

যাকাত শুধু গরিবের জন্য নির্ধারিত। নিকটতম গরিব আত্বীয় তা প্রথমে পাবেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ শোধ করার জন্য যাকাত নিতে পারেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভ্রমণকারী ব্যক্তি কোনো কারণে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে যাকাত নিতে পারেন। পড়াশোনার খরচ বহন করার জন্য, যাকাত সংগ্রহকারীর বেতন হিসেবে যাকাত গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য যাকাত খরচ করা যেতে পারে, যেমন ধর্মযুদ্ধে রত সৈনিকের জন্য।

মানবতার সেবায় ইসলামের অনেক নিয়ম পরিচালিত। দারিদ্র থেকে দরিদ্র বের করে উপার্জনের পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাকাত ফাণ্ড তৈরি করা যেতে পারে। যেমন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য তাকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠত করার জন্য প্রাথমিক ইসলামের আমলে করা হতো। এতিমদের প্রতিপালনের জন্য ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সদকা ও যাকাত সংগ্রহ করে এতিখানা পরিচালনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশে এরুপ বহু এতিখানা ও মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে।

মানবতার সেবায় একজন মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর মসজিদ নির্মান করে, কবরস্থান স্থাপন করে, বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে, বিধবাদের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে, পয়ঃনালী নির্মান, পুকুর খনন, খাল খনন করে পানির ব্যবস্থা করে সর্ব সাধারণের উপকার করতে পারে। মসজিদ নির্মাণের বহু উদাহরণ পৃথিবীতে আছে, যেমন আল আযহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এরুপ একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলাদেশের বহু মসজিদ সমাজ সেবীদের উৎসাহী ছিলেন।

এভাবে ঈদুল ফিতরের ফিতরা ও কোরবানির ঈদের গোস্ গরিব আত্বীয়স্বজনের মাঝে বিতরণর ব্যবস্থাও ধর্মীয় বিধান। সম্পদশালী ব্যক্তি হজ্বব্রত পালন করে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে একত্রিত হতে পারে, ভাব আদান প্রদান করতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে পারে-এটাও ধর্মীয় বিধান। দেশ ভ্রমন করে স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি অবলোকন করার বিধানও ইসলামে পাওয়া যায়। পরিবারের সবার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায়

Dhaka University Institutional Repository

রাখা, পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করা, বিধর্মীদের সাথে আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করার শিক্ষা ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকেও ইসলাম উৎসাহিত করে। মানবতার সেবায় যে ধর্ম আত্মনিয়োগ করার তাগিদ দিয়েছে তা যথাযথ ভাবে পালন করলে সমাজে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা হবেই, ইসলাম ইহাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি

একমাত্র ইসলামই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতি গ্রহণ করেছে। ইসলামই সাম্যের পথ দেখায়। প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের তৈরী করা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রথমে চমক নিয়ে আসলেও পরিণতিতে তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা জাগতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকায় আগমন করলেও পরবর্তীতে তা নিজেই রোগী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। মানুষ মানবরচিত এসব বিধি-বিধানের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। তাদের সমস্যা না কমে বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐসব নিয়ম-নীতি তাদেরকে অলস, বেকার ও অক্ষম বানিয়েছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র নায়করা 'সামাজিক নিরাপত্তা' নামক নতুন শ্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছে। ইসলাম পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ কোনটাই নয়। ইসলাম হল বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত দ্বীন। ইসলামের মতে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্র মানুষ হল তার তত্ত্বাবধায়ক।[১৩৫] যেহেতু সে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী সেহেতু সে তা মূল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

এ পৃথিবীতে স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। এ মানুষের জীবিকা ও জীবনোপকরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কতগুলো ঘোষণা কুর'আন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল:

"আমিতো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৩৬]

উপরোক্ত আয়াতে 'আদম সন্তান' বলতে সব মানুষই উদ্দেশ্য। অতএব নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণপনা, দুনিয়ার সর্বত্র অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা, উত্তম খাদ্য ও জীবনোপকরণ পাওয়ার এবং অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপনের সুযোগ থাকতে হবে। বস্তুত এ হচ্ছে মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহের অংশীদার সমানভাবে সব মানুষ।

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১৩৭] 'তোমাদের জন্য' বলতে বোঝানো হয়েছে সামগ্রিকভাবে সব মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য। তাদের সকলের জৈবিক

---

১৩৫ আল-কুর'আন, ৫৭ : ৭

১৩৬ ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا আল-কুর'আন, ১৭ : ৭০

১৩৭ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا আল-কুর'আন, ২ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা পূরণার্থে, তাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ স্বরূপ। কুর'আনের এ ঘোষনার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই গোটা মানবজাতির অধিকারভুক্ত। তার অংশ পাওয়া থেকে কেউই বঞ্চিত থাকতে পারে না; যারা নিজেরা পেল তারা তো পেলই। যারা নিজেরা পায়নি, তাদের জন্যও পাওয়ার ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছে তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।"[১৩৮] "আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি।"[১৩৯] "তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিন সময়ের মধ্যে তিনি এতে সমভাবে সকলের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।"[১৪০] "আমিই পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি।"[১৪১]

এ আয়াত সমূহের মূল কথা হল : এ বিশ্ব প্রকৃতির অস্তিত্ব দান ও বিশেষ নিয়মের অধীন নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং বিশেষভাবে মানুষের রিয্ক, জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহ ও পরিবেশনের লক্ষ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। কেননা সৃষ্টিকর্তা তাঁর সেরা সৃষ্টি এ মানুষকে জীবন দিয়েছেন, তিনিই তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছেন একান্ত দয়াস্বরূপ। জীবন দেবেন, কিন্তু জীবিকা দেবেন না-তা মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তা ও করা যায় না। আল্লাহর এ জীবিকা দান ব্যবস্থা কিছু সংখ্যক সৃষ্টির জন্য নয়, সমগ্র জীব এবং প্রাণীকূলের জন্য যেমন ঠিক, তেমনি জীবিকার ব্যবস্থা এবং তার নিশ্চয়তা কিছু সংখ্যক বা একশ্রেণীর মানুষের জন্য নয়, নির্বিশেষে সকল কালের সকল দেশের সব মানুষের জন্যই এ ব্যবস্থা।

ইসলামী বিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈমানের সঙ্গে বাস্তব কাজের সংগতি স্থাপন করার তীব্র তাকীদ। সমাজে স্বাভাবিকভাবেই এমন অসহায় বালক-বালিকা থাকতে পারে, যাদের প্রয়োজন পূরণের প্রত্যক্ষ

---

১৩৮ الله الذى خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها -
আল- কুর'আন, ১৪ : ৩২-৩৪

১৩৯ ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون আল-কুর'আন, ৭ : ১০

১৪০ قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين আল-কুর'আন, ৪১ : ৯-১০

১৪১ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا আল-কুর'আন, ৪৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালনকারী পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তারা চরমভাবে অসহয়ায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে, থাকতে পারে অসংখ্য গরীব-মিসকীন-ফকরী। এরূপ অবস্থায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও খোরাক-পোশাক যোগানোর দায়িত্ব সে সমাজকেই বহন করতে হবে, যে সমাজে তারা বসবাস করছে। সে সমাজ যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে এ অসহায়দের দুনিয়ায় বেচে থাকার আর কোন উপায়ই থাকে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাধ্যমে যে বিধান নাযিল করেছেন, তাতে এ লোকদের জন্য সমাজের লোকদেরকেই দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত যে সমাজ সে দায়িত্ব পালন করে তাই আল্লাহর এবং তাঁর নাযিল করা দীনের প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবি করতে পারে। অন্য কথায়, আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমানদার হতে হলে সমাজের এ অসহায় লোকদের অন্ন যোগানোর ও তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দানের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে নতুবা আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি তাদের ঈমান নেই বলেই প্রমাণিত হবে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দীন ইসলাম (অথবা বিচারের দিন) কে অসত্য মনে করে, তার বিষয়ে কি তুমি বিবেচনা করেছ? সেতো সে-ই যে ব্যক্তি ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়–প্রত্যাখ্যান করে এবং মিকীনকে খাদ্য (নিজে তো দেয়ই না), অন্য লোকদেরও তা দেয়ার জন্য উৎসাহিত করে না।"[১৪২]

দীন ইসলামের প্রতি কিংবা পরকালের প্রতি ঈমানদার হতে হলে সমাজের ইয়াতীম মিসকীন প্রভৃতি অসহায় লোকদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে। ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে ব্যক্তির সামর্থ্যানুযায়ী এবং সমষ্টিগতভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগ-আয়োজনের মাধ্যমে সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলতে হবে, যার ফলে অসহায় দরিদ্র লোকেরা জীবন-জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে।

উপরিউক্ত আয়াতাংশ একটি ধনশালী, অহংকারী ও মানবতা বিদ্বেষিত সমাজের এবং তাতে ইয়াতীম-মিসকীন প্রভৃতি অসহায় লোকদের চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনা-অপমানের করুণ চিত্র তুলে ধরছে। এরূপ সমাজ কখনই দীন ইসলামের ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সমাজ হতে পারে না, মুখে ঈমানদারীর যত বড় দাবিই করা হোক না কেন। কেননা আল্লাহর নিকট ঈমানদারীর মৌখিক দাবির কোন মূল্য নেই। ইসলাম নিছক বিশ্বাসের ব্যাপারও নয়। ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে সাথে বাস্তব কাজে তার প্রতিফলন ঈমানের সত্যতার জন্য অপরিহার্য শর্ত। অতএব যে লোক আল্লাহ, পরকাল ও দীন ইসলামের প্রতি ঈমানদার, তাতে সমাজের এ অসহায় লোকদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। তবেই তার ঈমানের যথার্থতা ও প্রমাণিত ও স্বীকৃত হবে।

কিয়ামতের দিন যেসব লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের একটি অপরাধ থাকবে আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার। আর দ্বিতীয় অপরাধ থাকবে ইয়াতীম-মিসকীনকে খপাবার না দেয়ার, খাবার দিতে অন্যদের উৎসাহিত না করার। কুর'আন মাজীদেই বলা হয়েছে, "(নির্দেশ দেয়া হবে) ধর লোকটিকে, তার গলায়

---

[১৪২] ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذى يدع اليتيم ارايت الذى يكذب بالدين আল-কুর'আন, ১০৭ : ১-৩

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁস লাগাও। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর তার উপর তাকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে ফেল। সে লোকটি না আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল, না মিসকীনকে খাবার দিতে লোকদের উৎসাহ দিত।"অপর একটি আয়াতে জাহান্নামীদের অপরাধের স্বীকারোক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে, "আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলাম না এবং মিসকীনকে খাবারও খাওয়াতাম না।"[১৪৩]

অর্থাৎ যেসব অপরাধের দরুণ মানুষ কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে, মিসকীন-গরীব-ফকীর লোকদের খাবার না খাওয়ানো এবং খাবার দেয়ার জন্য অন্য লোকদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ না করা তার মধ্যে অন্যতম। অভুক্ত লোকদের খাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যে সাধারণভাবে সমাজের সব লোকের তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

খোদ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে লক্ষ্য করে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তুমিওতো ইয়াতীম ছিলে। আল্লাহ্ তোমার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলেই তোমার পক্ষে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেছে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়েছে। অতএব সমাজের সব ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তোমার রয়েছে।

"হে নবী! তোমাকে কি তোমার আল্লাহ একজন ইয়াতীমরূপে পান নি? অত:পর তিনিই তো তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমাকে কি তিনি পথহারা পান নি? পরে তিনিই তো তোমাকে জীবন বিধান ও পথের সন্ধান দান করেছেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায় পরে তিনিই তোমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করেছেন। অতএব ইয়াতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। ভিক্ষাপ্রার্থীকে তুমি রূঢ়তা দেখিয়ে তাড়াবে না। বরং আল্লাহর দেয়া নি'আমতের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাবে।"[১৪৪]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন ইয়াতীম পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তি। আল্লাহই তাঁকে পিতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অতএব সমাজের সব ইয়াতীম, অসহায় লোকদের জন্য আশ্রয়, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন বিশ্ব মানব মুক্তির সন্ধানী, নিপীড়িত, নিগৃহীত ও জ্ঞানান্ধ মানুষের প্রদর্শন প্রয়াসী। আল্লাহ তাঁকে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করে ও তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে দীন ইসলাম নাযিল করে তাঁকে জীবন পথ ও দায়িত্ব জানিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব তাঁরই দায়িত্ব হচ্ছে দুনিয়ার আদর্শহীন মানুষকে আদর্শবাদী বানানো, পথহারা ও লক্ষ্যহীন মানুষকে পথের সন্ধান দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিযাত্রী বানানো। তিনি ছিলেন পরিবার বহনের

---

১৪৩ ولم نك نطعم المسكين قالوا لم نك من المصلين আল-কুর'আন, ৭৪ : ৪৩-৪৪

১৪৪ وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فاوى আলকুর'আন, ৯৩ : ৬-১১

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বশীল, অথচ দরিদ্রতম ব্যক্তি। আল্লাহই তাঁকে সচ্ছলতা দান করেছিলেন, অন্য লোকদের নিকট ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার লাঞ্ছনা থেকে তিনিই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অতএব তাঁরই (রাসূলের) দায়িত্ব এমন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে না। শুধু তাই নয়, তার এ অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সে একবিন্দু উপেক্ষা বা লাঞ্ছনা ভোগ করতেও বাধ্য হবে না। তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান ও অপমানও করবে না।

শুধু ইয়াতীম ও মিসকীনের কথাই নয়। সমাজে বহু অসহায়, অক্ষম, বৃদ্ধ বা বিধবা স্ত্রীলোক থাকতে পারে, থাকতে পারে বহু ঋণগ্রস্ত ও নিপীড়িত ক্রীতদাস-দাসী। তারা মনিব ও মালিকের হাতে নিরন্তর অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করতে থাকে। সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায়ই তাদের নেই। এরূপ অবস্থায় সমাজের মধ্য থেকে যদি এমন লোক বের হয়ে না আসে যারা স্বত:স্ফূর্তভাবে তাদের জীবিকা ও উক্তরূপ অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে, তাহলে তারা কোনদিনই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। ইসলাম যেহেতু মযলুম মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ, সে কারণে ইসলাম শুরু থেকেই এ কাজকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে এবং তাকে ঈমানী দায়িত্বভুক্ত করে ঘোষণা করেছে। ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াতী পর্যায়ে-মক্কাতেই কুর'আন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হয়েছিল, "উভয় স্পষ্ট পথ কি আমি তাকে দেখাই নি? কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জান সে দুর্গম ঘাঁটিপথ কি? তা হচ্ছে দাস-দাসীদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা বা উপবাসের দিনে নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি-মলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, অত:পর সে ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। এরাই হবে ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার লোক।"[১৪৫]

মক্কার কঠিনতম দিনে অবতীর্ণ ও আয়াতে মূলত একটি ইসলামী সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এ কঠিনতম কাজের বিভিন্ন বাস্তব দিকের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সে কাজগুলো হচ্ছে: ক্রীতদাসদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, ঋণের ভারে জর্জরিত লোকদের ঋণ পরিশোধ করা, উপবাসের দিনে খাদ্যাভাবে ও দুর্ভিক্ষের সময়ে নিকটবর্তী ইয়াতীম বা দারিদ্র্য লাঞ্ছিত ধূলি মলিন মিসকীনদের খাবার খাওয়ানো। এমন একটি সমাজের মধ্যে বসবাস গ্রহণ, যেখানকার মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, যে সমাজের লোক পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল, বিপদে ধৈর্য্য ধারণের মৌখিক উপদেশদাশের সাথে সাথে কার্যত বিপদমুক্তির কাজে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হয়, দয়াশীল হওয়ার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং উৎসাহিত করে কুর'আনের দৃষ্টিতে এ কাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও এ কাজ যারা করবে, তারাই প্রকৃত ভাগ্যবান তারা ভাগ্যবান এ জগতে ও পরকালে।

---

[১৪৫] وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة আল-কুর'আন, ৯০ : ১০-১৮

Dhaka University Institutional Repository

আর এটাই হচ্ছে, ইসলামী সমাজের উজ্জ্বল চিত্র। মহান আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য-এ সমাজই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) মূলত এরূপ একটি সমাজ গড়ে তোলার কঠিনতম কাজেই অহর্নিশ ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজের কথা দ্বারাও লোকদের এ কাজের উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। মুসলমানদের উক্ত রূপ উন্নত চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ পর্যায়ে তার নিজের বর্ণিত অসংখ্য বাণির মধ্য থেকে মাত্র একটি বাণী (হাদীস) দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উদ্বৃত করা যাচ্ছে:

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্য কাজে চেষ্টাকারী ও উদ্যোগ গ্রহণকারী এবং ব্যবস্থাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমমর্যাদা সম্পন্ন।"[১৪৬]

বস্তুত ইসলামী জিহাদের লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার এমন একটি সমাজ গড়া ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে ইয়াতীম-মিসকীন-বিধবা প্রভৃতি অসহায় ব্যক্তি নিজেদের জীবন ও জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে, যেখানে দরিদ্র ব্যক্তি কিংবা আকস্মিকভাবে সর্বহারা হয়ে যাওয়া বা অসহায় হয়ে পড়ো বাকি নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে কোনরূপ অনিশ্চয়তা বোধে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য হবে না। গোটা সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই সেজন্য দায়িত্ব পালনে সতত প্রস্তুত হয়ে থাকবে এবং কার্যত এগিয়ে আসবে।

সাধারণ মানুষ স্বার্থবাদী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। নিজের সুখ-সুবিধা হতে দেখলে মানুষ খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তখন সে হয়ত আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ যখন পরীক্ষাস্বরূপ কারোর ধন-সম্পদকে পরিমিত করে দেন, তখন সে ফরিয়াদ করে উঠে। এমনকি 'আল্লাহ তাকে অপমান করেছেন বলতে ও দ্বিধা বোধ করে না। এ হীন মানসিকতা আল্লাহর পছন্দ হতে পারে না। তাই তিনি এ মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, "না, কখনই নয়, আসল ব্যাপার হচ্ছে, (তোমাদের মানসিকতা এতই হীন ও সংকীর্ণ যে) তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর না এবং গরীব-মিসকীনদের খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, তোমরা লোকদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পত্তি বেমালুম হযম করে ফেল। আর ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা দিশে হারিয়ে ফেল।"[১৪৭]এ আয়াতে সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে: আধুনিক পরিভাষায় বললে তা হচ্ছে অর্থ লোলুপ পুজিবাদীদের সমাজ। পুঁজিবাদীরা ধন-সম্পদেব পূজারী। যে কোন উপায়ে হোক, ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নেয়া এবং নিজেদের সঞ্চিত সম্পদে কোন কারণেও এক বিন্দু কমতি আসতে না দেয়ার জন্য তারা সচকিত হয়ে থাকে সর্বক্ষণ।এ মানসিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটে ইয়াতীম বালক-বালিকাদের প্রতি উপেক্ষো ও অসম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। অথচ তারাও মানুষ, মানুষের সন্তান। সবার মত সুখ স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও রয়েছে। কিন্তু তারা পিতৃহারা হয়েছে বলে তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হচ্ছি।

---

[১৪৬] الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৪৬৮

[১৪৭] وتحبون المال حبا جما وتاكلون التراث اكلا لما ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم আল-কুর'আন, ৮৯ : ১৭-২০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটে সমাজের অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র-পীড়িত লোকদের প্রয়োজন পূরণে চরম অনীহা প্রদর্শনে, তাদের খাবার যোগানোর ব্যাপারে কোনরূপ দায়িত্বানুভূতি না থাকার কারণে। অথচ তারাও সমাজের মানুষ। তাদেরও, পেট ভরে খাওয়ার অধিকার রয়েছে আমদেরই মত। তাদের অভাব গ্রস্ত হবার জন্য কেবল তারাই দায়ী নয়: সেজন্য বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। হয়তো তারাও একদিন সচ্ছল ছিল। কিন্তু পুঁজিপতিদের শোষণের ফলে তারা সর্বহারা হয়ে পড়েছে। অথবা প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনের ক্ষমতা রাখে না বলেই তাদের এ দারিদ্র্য। কিংবা তারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না শুধু এ কারণে যে, মালিকরা তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য দিচ্ছে না। তাদের দ্বারা পুরোপুরি কাজ করিয়ে নিচ্ছ, অথচ তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ মজুরী দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে কিংবা এও হতে পারে যে, শ্রম করার মত শক্তি ও দৈহিক বল তাদের নেই। এসব অবস্থার মধ্যেই তাদেরও তাদের উপর নির্ভরশীলদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বতো গোটা সমাজের। কেননা তারাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয় যে, তাদের পিতা-মাতা হয়তো অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সমাজের লোকেরা তাদের অজ্ঞাতসারে কিংবা তাদের জ্ঞান না হওয়ার সুযোগে তাদের উওরাধিকার বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত সহায়-সম্পত্তি অপহরণ করে নিয়েছে। ফলে তারা এখন দরিদ্র-সর্বহারা হয়ে পড়েছে। এজন্য তো সমাজই দায়ী।

ইসলামী মতে অসহায় লোকদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করা সমাজের দায়িত্ব। তারা যাতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য না হয়, সেজন্য কোন না কোন ব্যবস্থা বা সংস্থা গড়ে তোলাও সমাজেরই কর্তব্য। কিন্তু না আমরা নিজেরা খাবার দিচ্ছি, আর না তা দেয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা বা সংস্থা গড়ে তুলছি। তা না করা পর্যন্ত আমরা তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন থেকে কখনই মুক্তি পেতে পারি না।"[১৪৮] মুলত ইসলামে এভাবেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

---

[১৪৮] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা প্রথা ও প্রতিষ্ঠান (যাকাত, বায়তুলমাল, উশর, ওয়াক্‌ফ ও অন্যান্য)

যাকাত

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মুল স্তম্ভের মধ্যে একটি। যাকাত এবং হজ্জ হলো আর্থিক ইবাদত। বাকি তিনটির মধ্যে কলেমা হলো আত্মিক এবং নামায ও রোযা হলো শারীরিক ইবাদত। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কোরআনে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ পাক শারীরিক ভাবে সুস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে রুজীর অন্বেষণে কাজ করতে ও চেষ্টা চালাতে বলেছেন। যাতে সে নিজের পরিবার-পরিজন সন্তুতির ভরণ-পোষণ করতে পারে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে সে আল্লাহর পথে কিছু দান খয়রাতও করবে। যদি কোন ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতার জন্য কাজ করতে না পারে এবং তার কাছে জমানো কোন সম্পদ অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পদ না থাকে যা দিয়ে সে নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিকট আত্মীয়দের উপর। কিন্তু যে সকল দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও শারিরিক ভাবে যারা অক্ষম, যাদের দায়িত্ব নেয়ার মত কোন সচ্ছল ও বিত্তবান আত্মীয় নেই, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। এ অবস্থায় সে তারা কি করবে ? তারা কি না খেয়ে মারা যাবে, ইসলাম কি তাদের ফেলে দিবে? না ইসলাম সমাজের এ ধরণের লোকদেরকে ভুলে যায়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বিত্তবানদের সম্পদে একটি নির্ধারিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এ পরিমাণ অর্থ প্রদান করা প্রত্যেক ধনবান মুসলিমগণের উপর ফরয করা হয়েছে। যাকে ইসলামে বলা হয় যাকাত। যাকাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গরীব-মিসকীনদের অভাবকে খতম করা। যাকাতের হকদারেদের মধ্যে ফকীর-মিসীনরাই তালিকার প্রথমে রয়েছে। বরং কিছু স্থানে তো মহানবী (স.) যাকাত গ্রহণকারীদের তালিকা বর্ণনাকালে ফকীর মিসকীনদেরকেই শুধু দিতে বলেছেন। যেমন হযরত মু'আযকে (রা.) ইয়ামান প্রেরণকালে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীব-মিসকীনদেরকে তা দেবে।

যাকাত আরবি শব্দ। যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা, বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা-সুসংবদ্ধতা ইত্যদি। কুরআন মজিদে 'যাকাত' শব্দটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে একটি সর্বজন-পরিচিত শব্দ হিসেবে ত্রিশটি আয়াতে। তন্মধ্যে সাতাশটি আয়াতে নামাযের সঙ্গে একত্র করে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি আয়াত নামাযের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত হয়েছে। অবশিষ্ট যে ত্রিশটি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে আটটি হচ্ছে মক্কী সূরায়। আর সবকটিই মাদানি সূরায় রয়েছে।

আভিধানিক অর্থে যাকাত বলতে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা ইত্যাদিকে বুঝায়। এসব কয়টি অর্থই কুরআ'ন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। ওয়াহেদী প্রমুখ বলেছেন, বাহ্যত এর মৌলিক অর্থ হচ্ছে আধিক্য ও প্রবৃদ্ধি। আরবীতে বলা হয় কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যে জিনিসই বৃদ্ধি পায়, তাই 'যাকাত' হয়। কৃষিফসল ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া তখনই সম্ভব যখন তা আবর্জনা মুক্ত হয়। তাই 'যাকাত' শব্দটিতে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা বিদ্যমান। ব্যক্তির গুণ বর্ণনায় 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হলে তা হবে সুস্থতা-সুসংবদ্ধতা অর্থে। তখন ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণের আধিক্য হওয়া বোঝাবে। যেমন বলা হয়, অর্থাৎ পবিত্র জাতির মধ্যে চরম মাত্রার কল্যাণসম্পন্ন ব্যক্তি।[১৪৯]

বস্তুত যাকাত-বাবদ আদায়কৃত অর্থ যদি একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়, তবে ইহা দ্বারা বিরাট জাতীয় কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। দেশের ইয়াতিম, মিসকিন, অক্ষম, পঙ্গু, অন্ধ, অসহায় সম্বলহীন বিধবা ইত্যাদি সকল মানুষের জন্যই স্থায়ী সংরক্ষন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব।

পরিভাষাগত অর্থ

ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ। একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি সারা বছরের ব্যয় নির্বাহের পর সারে সাত তোলা স্বর্ণ এবং সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে তার অতিরিক্ত যে সম্পদ তাঁর কাছে জমা হবে তার শতকরা ২.৫ (আড়াই শতাংশ হারে) দান করাকে যাকাত বলা হয়।

ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল মাল বা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা যাকাত দাতার অন্তরকেও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। এদিকে ইংগিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করবে। তার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"

---

[১৪৯] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত* (বয়রুত: আর-রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০) খ.১, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মালের যাকাত

যাকাতের উৎস দুর্বল বা সংকীর্ণ নয় বরং তা বিশাল এবং প্রশস্ত। নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু-পাখি ছাড়াও কৃষি পণ্যের যাকাত যেমন তরকারী, ফল, শাক প্রভৃতির উপর দশমাংশ অথবা বিশভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বাণী হল,"যে জমি আকাশ এবং ঝর্ণার (আল্লাহর রহমতের) পানিতে সিক্ত হয় তার উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ এবং যে জমিতে কূপ অথবা নদী প্রভৃতির মাধ্যমে সেচ দেয়া হয় তার উৎপাদনের বিশ ভাগে এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।"[১৫০]

বর্তমান যুগে ভবন ও ফ্যাক্টরীকে কৃষি জমির সাথে কিয়াস করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে এসেছে যে, মধুর উপরও মোট উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ যাতাক দিতে হবে এবং অন্যান্য প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন রেশম গুটি ও দুধদানকারী গাভী এবং মহিষ প্রভৃতিকে এর উপর কিয়াস করতে হবে। কিয়াস সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট সে শরী'আতের মূল বিষয়ের একটি, যা আল্লাহ তা'আলা হক ও ইনসাফের সাথে নাযিল করেছেন। এ জন্য যেভাবে দু'টি ভিন্ন বস্তুকে যেমন এক বলা যায় না তেমনি দু'টি একই ধরণের বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও করা যায় না। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের মালের উপর প্রত্যেক নিসাবধারী মুসলমানের আড়াই ভাগ যাকাত ফরয হয়। দুধপ্রাপ্তি যোগ্য এবং বংশ বিস্তারের জন্য রক্ষিত প্রাণী যেমন উট, গাভী, বকরী প্রভৃতির উপরও প্রায় একই পরিমাণ যাকাত ফরয হয়ে থাকে। শর্ত হল নিসাব পর্যন্ত পৌছতে হবে এবং বছরের বেশির ভাগই বিনা মূল্যে ঘাসপানি খাইয়ে চরান হয় এমন হতে হবে। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক (র) চতুস্পদ জন্তুর যাকাত ঐ অবস্থাতেও ওয়াজিব করেছেন যখন তার মালিক সারা বছর খাইয়েছে এবং পানি পান করিয়েছে। কতিপয় সাহাবা এবং তাবেয়িন ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা এ মতেরই সমর্থক।

খননকৃত পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের উপরও পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। ফকীহদের মতে, খনিজসম্পদও এ নির্দেশের আওতায় আসবে। যদিও এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ পঞ্চমাংশ যাকাতের মত বন্টন করে দিতে হবে অথবা তাকে ফাই এর মালের মত রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হবে।[১৫১]

---

[১৫০] فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৫৫, হাদীস নং ১৪৮৩

[১৫১] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *মাশকালাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা 'আলাজাহাল ইসলামু* (কায়রো: ওয়াহবা পাবলিশার্স, ২০০৩), পৃ. ৬৪-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের অন্যতম 'রুকন' বা স্তম্ভ । যাকাত যে, ফরয তা কুর'আনের স্পষ্ট ঘোষণার ও মহানবী (স.) এর হাদীসে 'মুতাওয়াতির' দ্বারা প্রমাণিত। পূর্বের ও পরের গোটা উম্মতের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা স্বীকৃত।

অনান্য নবীদের সময় যাকাত

"এবং আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই 'ইবাদত করত।"[১৫২]

এর কিছু পূর্বে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-তাঁদেরকে ঐশীগ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিল। যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী ছিল। মানুষকে সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিত। তারপর বিস্তারিতভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে নমরূদের অগ্নিকুন্ড তাঁর জন্য আরামদায়ক হয়েছিল। অতপর প্রসঙ্গক্রমে হযরত লূত, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামের কথা এসেছে। তারপর বলা হয়েছে- আমি সমস্ত নবীকেই সৎকাজ, নামায এবং যাকাতের কথা বলেছিলাম। অর্থাৎ অতীতের সমস্ত নবীগণের শরী'আতেই যাকাত ফরয ছিল এবং সর্বদা এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি ফরয হিসেবেই কার্যকর থাকবে।

ঈসা (আ.) এর প্রতি ওসিয়ত

আল-কুর'আন হযরত ঈসা (আ.) এর ভাষায় বলছে যে, আল্লাহ আমাকে ওসিয়ত করেছেন যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন নামায কায়েম করব এবং যাকাত দেব। "তিনি (আল্লাহ তা'আলা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।"[১৫৩]

এ আয়াতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) নবুয়ত লাভ করার কথা লোকদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে নবুয়তের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর নির্দেশের আওতায় থেকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

---

[১৫২] وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين আল-কুর'আন, ২১:৭৩

[১৫৩] وأوصانى بالصلاة والزكوة ما دمت حيا আল'কুরআন, ১৯:৩১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইসমাঈল (আ.) এর তাকীদ

হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে নামায ও যাকাতের ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় প্রতিটি শরী'আতের জন্য এ দুটো 'ইবাদাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ বলেন- "তিনি (হযরত ইসমাঈল আ.) তাঁর পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।"[১৫৪]

যাকাত প্রদানে অস্বীকার ব্যক্তি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত

সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ্ যাকাতকে হিদায়াত লাভের শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এ কুর'আন মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।"[১৫৫]

যাকাতকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, একে হিদায়াত লাভের পূর্ব শর্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ শর্তটি না মানা অর্থাৎ যাকাত না দেয়া হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকারই নামান্তর। যারা কৃপণ, দুনিয়া পূজারী, সম্পদ-প্রেমিক, আল্লাহর পথে খরচ করতে বিমুখ, হিদায়াতের মত সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটে না। পক্ষান্তরে যারা উদার, অকৃপণ, অপরের দুঃখ বেদনায় সহমর্মী, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনন্দচিত্তে তার প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তারা প্রকৃতপক্ষেই ঈমানদার এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যাকাত সাফল্যের চাবিকাঠি

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়।"[১৫৬]

যাকাত আদায়ে যারা অভ্যস্ত তারা তাদের যাবতীয় আমল পরিশুদ্ধির ব্যাপারে অভ্যস্ত। তারা নিজেদের প্রিয় সম্পদ থেকে আল্লাহর হক, নিঃস্ব-বঞ্চিতদের হক দিয়ে দিতে সামান্য কৃপণতা করে না। ফলে সম্পদের লোভ-মোহ থেকে তাদের অন্তর পবিত্র হয়। তাদের মনের পবিত্রতার প্রভাব তাদের চরিত্র, চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। পরিণতিতে তাদের গোটা জীবন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাদের জীবনাচারই বলে দেয় তারা কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত।

---

১৫৪ وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا আল'কুরআন, ১৯:৫৫

১৫৫ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون আল'কুরআন, ০২:২-৩

১৫৬ قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلوتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون আল'কুরআন, ২৩:১-৪

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত লাভজনক ব্যবসা

"যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"[১৫৭]

যাকাতের বৃহৎ প্রতিদান

"যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১৫৮]

যাকাতের প্রতিদান কিভাবে দেয়া হয় তার এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকিত হয়েছে এ আয়াতটিকে। আমরা যে বীজ বপন করি তার ছোট একটি দানা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে উদগত হয় ছোট্ট একটি শিশু গাছের। সে শিশু চারাটি একদিন মিশে একাকার হয়ে শতগুণ ফসল প্রদান করে। এমনি ভাবে আখিরাতে আমরা যাকাতের বিনিময় পাব, শুধু তাই নয় দুনিয়ায়ও আমাদেরকে তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

যাতাক ও সুদের বিপরীত পরিণতি

"আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।"[১৫৯] যাকাত ও সাদাকাতের মধ্যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ আবর্তিত হয়। একজনের কাছে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় না। সমাজের ধনী থেকে গরিবদের মাঝে তা আবির্তত হয়। পক্ষান্তরে সুদের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের নিকট সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে। গরিবের রক্ত পানি করা শেষ পারিশ্রমিকটুকুও চলে যায় তাদের পকেটে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সুদের মাধ্যমে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং যাকাত প্রদানের কারণে সম্পদ খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কুর'আন বলেছে সুদে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না বরং ঘাটতি হয়।

---

১৫৭ إن الّذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلواة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنّه غفورٌ شكورٌ আল'কুরআন, ৩৫:২৯-৩০

১৫৮ مثل الّذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم আল'কুরআন,০২:২৬১

১৫৯ يمحق الله الرّبا ويربى الصدقات আল'কুরআন, ০২:২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটে যাকাত ও সাদাকাতের মাধ্যমে। যাকাত ও সাদাকাত হচ্ছে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ এবং সুদ মানবতার জন্য অভিশাপ। সুদের কারণে কৃপণতা, শঠতা, নির্মমতা ও হিংস্রতার মত কু-স্বাভাবগুলো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে তার ভেতরের মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে যাকাত মানবিক গুণাবলীর প্রস্ফুটন ঘটায়। তখন তার মধ্যে মনের প্রশস্ততা, দানশিলতা, সহমর্মিতা, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

হাদীসে এসেছে, যদি কোন মু'মিন আল্লাহর পথে একটি খেজুরও দান করে, তাকে তার বিনিময় আল্লাহ্ বর্ধিত করে পাহাড়ের সমান করে দেন। "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে-আল্লাহ্ হালাল ব্যতীত অন্য কিছু কবুল করেন না- আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তিনি তা লালন-পালন করতে থাকেন-যেমনিভাবে তোমাদের কেহ তার ঘোড়া অথবা গাধার বাচ্চা লালন পালন করে- এমনকি তা পাহাড় সম বড় হয়।"[১৬০]

যাকাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী

"যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৬১]

যাকাত অস্বীকারকারী কাফির

ইসলামী শরী'আতে যাকাত এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আলিমগণের মতে কেউ তা অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম নববী বলেছেন, যাকাত দেয়া ফরয এ কথা স্বীকার করে কেউ যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে দেখতে হবে, সেকি নও-মুসলিম হিসেবে এ সম্পর্কে এখনও জানতে পারেনি বলে তা করছে কিংবা সমাজ-সভ্যতা থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণে এরূপ মনোভাব পোষণ করছে? যদি তা হয়, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তখন তাকে ভালভাবে জানাতে ও বোঝাতে হবে এবং তারপর তার কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নিতে হবে। তখন দিতে অস্বীকার করলে অবশ্যই তাকে কাফির বলতে হবে।

---

১৬০ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحد كم فلوه حتى تكون مثل الجبل *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৮, হাদীস নং-১৪১০

১৬১ আল-কুর'আন, ০২:২৭৭ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে যাকাত

হযরত ইবন 'উমর (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্যদান, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, (সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের) হজ্জ করা, রমযানের রোযা রাখা।[১৬২]

অবশ্য রাসূল (স.) পাঁচটির পরিবর্তে কখনও কখনও দু'টি বা তিনটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কথার সূচনা স্বরূপ নামায ও যাকাতের উল্লেখ সর্বত্রই হয়েছে। এ দু'টির প্রতি লোকদের আহবান জানিয়েছেন, এ দু'টির উপর মুসলিমদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, "বুখারী-মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে নবী (স.) হযরত মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, "তুমি আহলে-কিতাবের একটি কাওমের কাছে যাচ্ছ। তাদের তুমি দা'ওয়াত দেবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্যদানের জন্য। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (ফরয) করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই মধ্যকার গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা এ কথাও মেনে নিলে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন তুমি তাদের ধন-সম্পদের উত্তম অংশ নিয়ে না নাও, আর মযলুমের বদ-দোয়াকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আবরণ বা অন্তরাল নেই।"[১৬৩]

বুখারীতে হযরত জারীর ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "আমি রাসূলের হাতে বাই'আত করেছি নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার উপর।"[১৬৪] বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি এজন্য যে, আমি যুদ্ধ করব লোকদের সাথে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।"[১৬৫]

---

১৬২ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا أله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وأيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাব নং-২, হাদীস নং-৮

১৬৩ حديث ابن عباس في الصحيحين : ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل اليمن فقال له : إنك تاتي قوما أهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله إلا الله واني رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعو الذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة توخذ من اعنيائهم فترد عى فقر انهم فان هم اطاعوا الذلك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه لبس بينها وبين الله حجاب- *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-১, হাদীস নং-১৩৯৫

১৬৪ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح الكل مسلم ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (নয়া দিল্লী: ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭) কিতাবুয যাকাত, বাব নং-২, হাদীস নং-১৪০১

১৬৫ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (কায়রো: আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি.) কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩২

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারি ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারি ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করে রাসূল (র.) বহু হাদীসে যাকাত না দেয়ার ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। এসব বলে তিনি মানুষের চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন এবং লোভী, স্বার্থপর ও কৃপণ মানুষদের দানশীল বানাতে চেয়েছেন।

পরকালীন শাস্তি

ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (স.) বলেছেন, "যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে গুলোকে তার বামে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হবে। পরে সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। এরপর সেগুলো দিয়ে তার পার্শ্ব, ললাট ও পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে; সেদিন যার সময়কাল পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে। হয়তোবা জান্নাতের দিকে নয়তোবা জাহান্নামের দিকে। গরু বা ছাগলের মালিকও যদি সেগুলোর হক তথা যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসা হবে, সেগুলো নিজেদের পায়ের খুর দিয়ে মালিককে পিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুতো মারবে। যখনই তার উপর সর্বশেষটি অতিবাহিত হবে তখনই প্রথমটিকে ফিরিয়ে আনা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন যে দিনের সময়কাল তোমাদের গণনামতে পঞ্চাশ হাজার বছর কালের সমান। পরে তাকে তার পথ দেখানো হবে, হয় জান্নাতের দিকে নয় জাহান্নামের দিকে।"[১৬৬]

দুনিয়ার শাস্তি

রাসূল (স.) বলেছেন, "যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন।"[১৬৭] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন, "তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়; চতুষ্পদ জন্তু না থাকলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত না অর্থাৎ জীব-জন্তুর কারণেই বৃষ্টি হয়।"[১৬৮] অপর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকবে সে মালকে ধ্বংস করে দেবে।"[১৬৯]

---

১৬৬ مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها الا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم احمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبهته وظهره فى يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله اما الى الجنة و اما إلى النار وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيامة تطؤه باظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه اخر اها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-২৪

১৬৭ আবূ মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আল-মুনযেরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু: মাওলানা আকরাম ফারূক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশী, ২০০০), খ. ১, পৃ. ২৮০

১৬৮ ولم يمنعوا زكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين আল মুনাযিরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০

১৬৯ ماخالطت الصدقة او قال الز كاة مالا إلا أفسدته উদ্ধৃত, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি

যারা যাকাত দানে বিরত থাকে তাদের জন্য একটি শরয়ী শাস্তিও রয়েছে। হাকিম অথবা রাষ্ট্র প্রধান এর দায়িত্ব নেবেন। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের আশায় যাকাত দিয়ে দেবে সে অবশ্যই এর সওয়াব পেয়ে যাবে। আর যে তা দিতে অস্বীকার করবে আমরা অবশ্যই তা তার মালের অংশ থেকে গ্রহণ করব। তা হচ্ছে আমাদের রবের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত সমূহের একটি সিদ্ধান্ত। মুহাম্মদের (স.) পরিবারের জন্য তার কিছু হালাল নয়।"[১৭০]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যাকাত দিতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবার আশায়। আর কেউ কার্পণ্য, সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার কারণে যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার কাছ থেকে তা জোর করে আদায় করতে হবে। এরূপ কঠোরতা ও বাধ্যবাধকতার কারণ হল সমাজের গরিব ও দুঃস্থদের অধিকার রক্ষা করা। কেননা যাকাত তাদের প্রাপ্য।

যাকাত দানে যারা বিরত থাকেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। তারা যদি তা করে তাহলে তাদের রক্ত আমর কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের জন্য কিছু করার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।"[১৭১]

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা যাকাত দিতে সম্মত হয়।

রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে আরবের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যদিও তারা নামায, রোযা পালনে প্রস্তুত ছিল। ভণ্ড নবী মুসায়লামা, সাজাহ ও তুলায়হা প্রমূখ তাদেরকে সমর্থন করে। সে সময় হযরত আবূ বকর (রা.) এর অবস্থান ছিল ঐতিহাসিক এবং অনন্য। তিনি দৈহিক 'ইবাদত নামায ও আর্থিক 'ইবাদত যাকাতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করতে

---

[১৭০] من أعطاها موتجر الله أجره ومن منعها فانا أخذو ها وشطر ماله عز مة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئ আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আস, *সুনান আবী দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৫

[১৭১] امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم الا بحق الإسلام وحسابهم على الله *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩২

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকার করেন। এ পর্যায়ে মহান সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা তুলে ধরলে প্রকৃত পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অনুসৃত নীতি ছিল এ। যাকে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেন এবং আবূ বকর (রা.) এর সাথে একত্রিত হয়ে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অনেকে মাতাহাদ বরণ করেন।

যাকাতের লক্ষ্য ও দাতার জীবনে তার প্রভাব

কুর'আন মাজীদ যাকাতের লক্ষ্য আলোচনার সময় যে ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হবে তাদের লক্ষ্য করে কয়েকটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত দুটি শব্দ দ্বারা যাকাতের লক্ষ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। কয়েকটি হরফের সমষ্টিতে গঠিত হলেও শব্দ দুটি যাকাত ফরয হওয়ার রহস্যসমূহ এবং তার সুমহান লক্ষ্যকে বিবৃত করেছে। শব্দ দুটি হল: 'পবিত্রকরণ' ও 'পরিশুদ্ধকরণ' যে আয়াতে কারীমায় শব্দ দুটি বর্ণিত হয়েছে তা হল: "তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।"[১৭২]

এ 'পবিত্রকরণ' ও 'পরিশুদ্ধকরণ' শব্দ দুটি সবধরনের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই তা বস্তুগত হোক অথবা আভ্যন্তরীন হোক, ধনী ব্যক্তির আত্মা এবং মন-মানসিকতা হোক অথবা তার ধন-সম্পদ হোক। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হল:

যাকাত লোভ থেকে মনকে পবিত্র করে

মুমিন ব্যক্তির জন্য অতি জরুরি হল তার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টিকারী স্বার্থপরতা নির্মূল করা। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে এ মারাত্মক লোভ ও কার্পণ্যের উপর বিজয়ী হওয়া ছাড়া তার পক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়।

লোভী ও কৃপণ ব্যক্তি সমাজের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। লোভ ব্যক্তিকে রক্তপাতের দিকে, মর্যাদা বিনষ্টকরার দিকে, দীনকে বিক্রয়করার দিকে এবং দেশ মাতৃকার খিয়ানতের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্যই রাসূল (স.) একে একটি বিধ্বংসী গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছিন। রাসূল (স.) বলেছেন,

---

১৭২ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا আল -কুর'আন, ০৯:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

"তিনটি ভাবধারা খুবই বিধ্বংসী- লোভ যা অনুসৃত হয়, লালসা যা পূরণে নিয়োজিত হতে হয় এবং ব্যক্তির নিজেকে নিয়ে আত্ম অহংকার।"[১৭৩]

কুর'আনে এ একই আয়াত দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। যারাই এ মারাত্মক রোগ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে তারাই সফলকাম হবে আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয় দুবার বলে তার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন এবং এ মারাত্মক রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল (স.) একটি ভাষণে বলেন, "তোমরা লোভ থেকে দূরে থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা লোভের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ লোভ তাদেরকে কার্পণ্য করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে তারা কার্পণ্য করতে শুরু করেছে। তা তাদেরকে নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছে। ফলে তারা নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। লোভ তাদেরকে পাপ কাজের নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা তাই করেছে।"[১৭৪]

এ অর্থের দিক থেকে যাকাত পবিত্রকারী। তা ব্যক্তিকে বিধ্বংসী কৃপণতা থেকে পবিত্র করে। ব্যক্তি যত বেশি যাকাত দেবে সে ততবেশি পবিত্র হবে, সম্পদ থেকে যাকাতের অর্থ বের করার মাধ্যমে সে প্রফুল্ল ও আনন্দিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সে প্রস্ফুরিত হবে।

যাকাত যেমন মনকে পবিত্র করে তেমন মনকে স্বাধীন করে। স্বাধীন বা মুক্ত করে সম্পদের বন্ধনের জিল্লতি থেকে, সম্পদের প্রতি আনুগত্য করা ও টাকা-পয়সার উপাসনা করা থেকে। কেননা ইসলাম চায় মুসলিম ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্র বান্দা হোক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু আনুগত্য ও অধীনতা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাক। পার্থিব সকল উপাদান ও বস্তুর সে মনিব হয়ে উঠুক। এর চেয়ে বড় দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীর খলীফা ও মনিব বানিয়েছেন অথচ সে নিজের নফসের দাসত্ব করতে সম্পদ ও বস্তুর পুঁজা শুরু করে দিয়েছে।

১৭৩

ثلاث مهلكات : شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه উদ্ধৃত, ফিকহুয যাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৮

১৭৪

اياكم و الشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح امر هم بالبخل فبخلوا و أمر هم بالقطيعة فقطعوا و أمر هم بالفجور ففجروا আবূ দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত দান ও ব্যয়ে অভ্যস্ত করে

যাকাত যেমন মুসলিম ব্যক্তির মনকে লোভ থেকে পবিত্র করে, তেমন ব্যয়, দানও খরচ করতে অভ্যস্ত করে। মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণে ও লক্ষ্য নির্ধারণে, আদত বা অভ্যাসের গভীর প্রভাব রয়েছে। এজন্যই বলা হয় মানুষ অভ্যাসের দাস।

যে মুসলিম দান করায় অভ্যস্ত, ফসল কাটার সময় তার হক বা যাকাত দিয়ে দেয়, তার আয়ের যাকাত সময় মত দিয়ে দেয়, গবাদি পশু, নগদ অর্থ ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত বছর পূর্ণ হতেই দিয়ে দেয়। ইদুল ফিতরের দিন ফিতরা দিয়ে নামাজে বের হয়, সে এমন মুসলিম দান সাদাকা করা যার মৌলিক গুণে এবং তার চরিত্রের একটি অনন্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এ কারণে এ চরিত্রটি কুর'আনের বিচারে মুত্তাকী মুমিনের অন্যতম গুণ হয়ে রয়েছে

আল্লাহ্‌র চরিত্রে ভূষিত হওয়া

মানুষ যখন লোভ এবং কৃপণতা থেকে পবিত্র হয়, দান ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়, তখন সে মানবীয় লোভের পংকিতলা থেকে উর্ধ্বে উঠে যায়। মানবীয় লোভ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, "মানুষতো অতিশয় কৃপণ।"[১৭৫] এবং সে আল্লাহ্ প্রদত্ত উচ্চতার গুণাবলীতে ভূষিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সমূহের মধ্যে অন্যতম হল- কোন ধরনের উপকার লাভের আশা ছাড়া কল্যাণ, রহমত, দান এবং দয়াবর্ষণ। মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে এ গুণাবলী সমূহ অর্জনের চেষ্টা করাই আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়ার নামান্তর। আর তাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্বের সর্বশেষ সীমানা।

ইমাম রাযী বলেছেন, "মানুষ যে 'নাফছে নাতেকা'র মাধ্যমে মানুষ হয়েছে তার দু'টি শক্তি রয়েছে, একটি হচ্ছে মতবাদগত, অপরটি হচ্ছে কার্যগত। মতবাদগত শক্তির পূর্ণত্ব আল্লাহ্‌র নির্দেশের সম্মান করার মধ্যে নিহিত। আর কার্যগত শক্তির পূর্ণত্ব আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করার মধ্যে নিহিত। এ জন্যই আল্লাহ্ যাকাত ফরয করেছেন যেন আত্মার মৌলিক শক্তি এ পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে। তা হচ্ছে বান্দার আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া, তাদের কাছে কল্যাণ পৌছানোর চেষ্টা করা, তাদের উপর আপতিত বিপদাপদ দূরীভূত করা।"[১৭৬] এ তত্ত্বকে সামনে রেখে রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র চরিত্রে ভূষিত হও।"[১৭৭]

---

১৭৫ وكان الانسان قتورا আল-কুর'আন, ১৭:১০০

১৭৬ ইমাম আল-ফাখরু আর-রাযী, *আত-তাফসীর আল-কাবীর* (বয়রুত: দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, সন নেই) খ. ১৬, পৃ. ১০১

১৭৭ تخلقوا باخلاق الله উদ্ধৃত, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র নি'আমতের শোকর

যাকাত দানের মাধ্যমে মুসলিমগণের মনে যে ভাবধারা জাগ্রত হয় তা হল, প্রতিটি নি'আমতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে হয়। আমাদের যা দেয়া হয়েছে যেমন: সম্পদ, সন্তান, সুস্থতা, ইলম বা জ্ঞান, নাক, কান চোখ ইত্যাদি সবকিছুর যাকাত আদায় করাই আল্লাহ্‌র নি'আমতের শুকরিয়া। এ জন্যই রাসূল (স.) বলেছেন, "প্রতিটি জিনিসেরই যাকাত আছে।"[১৭৮]

দুনিয়ার প্রতি লোভের চিকিৎসা

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে একটা লেষহীন চক্রের মধ্যে পড়ে অনন্তকাল আবর্তিত হতে দেয়া পছন্দ করেন না। আর সে চক্রটি হচ্ছে, ধন-মাল সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের চক্র। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান ধন-মাল একটা উপায় মাত্র তা চরম লক্ষ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয়ের পর তিনি তাকে বলে দিতে চান যে, এবার থাম, যা সঞ্চয় করেছ তা থেকে ব্যয় কর। আল্লাহ্‌র হক আলাদা করে দিয়ে দাও। ফকীর ও সমাজ সমষ্টির হক আদায় কর।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণের জন্য সম্পদ উপার্জন বৈধ করেছেন এবং পৃথিবীর সকল উত্তম ও পবিত্র জিনিস সমূহ তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত না হতে এবং দুনিয়াকে চিন্তা-চেতনার একমাত্র লক্ষ্য বানাতে নিষেধ করেছেন। কেননা মানুষকে তার চেয়েও মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করে পরকালীন স্থায়ী আবাস লাভ। সেজন্যই তাদের সবধরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার নীতি হল তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকেই ধন-সম্পদ দান করেন কাউকেই তিনি বঞ্চিত করেন না। আল্লাহ্ বলেন, "তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।"[১৭৯]

সুতরাং কারো ধন-মাল থাকলে তা একথা প্রমাণ করে না যে সে খুব ভাল ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র নিকট সে ব্যক্তিই উত্তম যে তাঁরই ভালবাসায় অসহায়জনকে নিজের হাতের সম্পদ দান করে ঐ পুরস্কার পাওয়ার জন্য যা আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে।

---

১৭৮ لكل شئ زكاة *সুনানু ইবন মাজা*, কিতাবুস সিয়াম, বাব নং-৪৪

১৭৯ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور আল-কুর'আন, ১৭:২০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-মাল কল্যাণকর বস্তু। কিন্তু তা এমন কল্যাণকর বস্তু যার দ্বারা মানুষদেরকে পরীক্ষা করা হয়। আল্লাহ্ বলেন "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ।"[১৮০] "মানুষতো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন।"[১৮১] "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।"[১৮২]

যাকাত ধন পবিত্র করে

যাকাত যেমন হৃদয়-মনকে পবিত্র করে তেমনি ধনীর ধন-মালকে পবিত্র করে ও বৃদ্ধি করে। মালের সাথে যদি অন্যের হক জড়িত থাকে তাহলে তা মালকে কলুষিত করে। তবে অপরের হক বের করে ফেললে তা পবিত্র হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূল (স.) বলেছেন, "তুমি যখন তোমার মালের যাকাত দিয়ে দিলে তখন তোমার থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে গেল।"[১৮৩]

যাকাত হারাম মাল পবিত্র করে না

যাকাত কেবল হালাল মালকেই পবিত্র করে। হারাম পন্থায় উপার্জিত তথা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি পন্থায় উপার্জিত সম্পদ, সুদ, ঘুষ, জুয়াখেলা, কালোবাজারি থেকে প্রাপ্ত সম্পদে বা অন্যকোন অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদকে যাকাত পবিত্র করে না। তাতে বরকত সৃষ্টি করে না। কেউ কেউ মনে করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ থেকে একটি অংশ যাকাত বা সাদাকা হিসেব দিয়ে দিলেই তাতে বাকী সম্পদ পবিত্র হয়ে যাবে। এটা একটি ভুল ধারণা। ইসলাম এ ধারণাকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্র নবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।"[১৮৪] "যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মাল সংগ্রহ করল, অতঃপর তা সাদাকা করে দিল, এতে সে কোন সওয়াব পাবে না। বরং তা তার উপর বোঝা হয়ে চাপবে।"[১৮৫] "আল্লাহ্ তা'আলা চুরি করা মালের সাদাকা কবুল করেন না এবং অজু বা পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না।"[১৮৬]

465879

---

১৮০ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ আল-কুর'আন, ৬৪:১৫

১৮১ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ আল-কুর'আন, ৮৯:১৫

১৮২ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ আল-কুর'আন, ৫৭:০৭

১৮৩ ابن খুজাইমা তার *সহীহ* গ্রন্থে; উদ্ধৃত, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৭

১৮৪ إن الله طيب لا يقبل الاطيبا *সহীহ মুসলি*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-৬৫

১৮৫ من جمع مالا من خرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان اصره عليه তারগীব, খ. ০১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

১৮৬ لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুত তাহারাতি, বাব নং-৩১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মালের প্রবৃদ্ধির কারণ

যাকাত মালে প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং মালের মধ্যে বরকত সৃষ্টি করে। অনেকের কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কেননা বাহ্যত এর মাধ্যমে সম্পদ কমে যায়। কেননা সম্পদের একটা অংশ বের করে দেয়াই যাকাত। কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীলরা জানেন যে, বাহ্যত এ হ্রাসের পেছনে রয়েছে প্রকৃত বৃদ্ধি। যাকাত দেয়ার মাধ্যমে যেমন দাতার মালে বরকত হয় এবং প্রবৃদ্ধি ঘটে তেমনি প্রবৃদ্ধি ঘটে সমাজের সামষ্টিক মালে। এ অল্প পরিমাণ সম্পদ যা যাকাত হিসেবে দেয়া হয় তা দাতার নিকট বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে, দাতার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। যে ব্যক্তি যাকাত দেয় তার জন্য অনেকে দোয়া করে, তাকে সাহায্য ও তার সম্পদের সংরক্ষণ করার জন্য অনেকে এগিয়ে আসে। এ যাকাত দানকারী ব্যক্তি যে যাকাত দেয় না সে এত কর্মতৎপর এত গতিশীল নয়। সম্ভবত কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ব্যাখ্যার দিকেই ইংগিত করছে: "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।"[১৮৭] "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১৮৮] "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়। তারাই সমৃদ্ধশালী।"[১৮৯] "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।"[১৯০]

গ্রহণকরীর জীবনে যাকাতের প্রভাব

যাকাত তার গ্রহণকারীকে মর্যাদাহানিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা ও কালের আবর্তন-বিবর্তন সমূহের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামে যাকাত এক কার্যকর ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ। কারা যাকাত গ্রহণ করে এবং কারাই বা এর দ্বারা উপকৃত হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, যেসব লোক যাকাত গ্রহণ করে এবং যাকাত দ্বারা উপকার লাভ করে তারা হল: ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তি, দারিদ্র্য যাকে পর্যুদস্ত করেছে। অথবা মিসকীন, অভাবগ্রস্থতা যাকে ধূলায় লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। অথবা ক্রীতদাস, দাসত্বের শৃংখল যাকে মনুষত্বের ও স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে। অথবা ঋণগ্রস্ত ঋণ যাকে হেস্ত-নেস্ত করেছে। অথবা নিঃস্ব পথিক যে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে নিরাশ ও অসহায় হয়ে পড়েছে।

---

১৮৭ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين আল-কুর'আন, ৩৪:৩৯

১৮৮ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم আল-কুর'আন, ০২:২৬৮

১৮৯ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون আল-কুর'আন, ৩০:৩৯

১৯০ يمحق الله الربا ويربي الصدقات আল-কুর'আন, ০২:২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত তার গ্রহীতাকে অভাবগ্রস্ততা থেকে মুক্তি দেয়

ইসলাম চায় মানুষ সুন্দরভাবে অতীব উত্তম ও পবিত্র জীবন যাপন করুক। প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনকে তারা ধন্য করুক। আসমান ও যমীনের বারাকাত সমূহ তারা লাভ করুক। উপর থেকে নাযিল হওয়া এবং তাদের পাদদেশ থেকে নির্গত নি'আমত সমূহ তারা ভোগ করুক। সে সৌভাগ্য তারা অনুভব করুক যা তাদের অবয়ব সমূহকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে দেবে, পরম শান্তি ও সমৃদ্ধিতে তাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরে দেবে। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের চেতনায় তাদের মন ও জীবন ভরপুর হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সৃষ্টি করে তাকে বললেন, "হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে পেটপুরে আহার কর।"[১৯১]

ইসলাম যে, দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, ধনাঢ্যতা পছন্দ করে এবং মানুষের পবিত্র স্বাচ্ছন্দ জীবন কামনা করে তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দরিদ্র রাসূলকে স্বচ্ছল বানিয়ে দিয়েছিলেন। কুর'আন বলছে, "তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।"[১৯২] হিজরতের পর মুসলিমগণের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন: "অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকা হিসেবে দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হয়।"

রাসূলে কারীম (স.) এর একটি প্রসিদ্ধ দোয়া হচ্ছে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাক্ওয়া, নৈতিক পবিত্রতা, রোগ নিরাময়তা ও ধনাঢ্যতার প্রার্থনা করছি।"[১৯৩] রাসূল (স.) আল্লাহ্‌র শোকর আদায়কারী ধনী ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল দরিদ্র ব্যক্তির উপর অধিক মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সম্পদশালীরাই পুরস্কার নিয়ে গেল।"[১৯৪]

এসব আয়াতের আলোকে আমরা বলতে পারি অনেকে দারিদ্র্যকে যেভাবে মহান মনে করে এবং ধনাঢ্যতাকে ঘৃণা করে তা ঠিক নয়। তা পারসিক চিন্তাধারা, ভারতীয় বৈষ্ণবাদী চিন্তাধারা, খৃষ্টীয় চিন্তাধারা

---

১৯১ يادم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما আল-কুর'আন, ০২:৩৫

১৯২ ووجدك عائلا فأغنى আল-কুর'আন, ৯৩:০৮

১৯৩ اللهم انى أسئلك الهدى والتقى والعفا والغنى ইমাম মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর, হাদীস নং-৭২

১৯৪ ذهب أهل الدثور بالاجور *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-৫২

Dhaka University Institutional Repository

এসব ইসলামের চিন্তাধারা নয় বরং বাইরে থেকে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী চিন্তাধারা এবং বিদ'আত।[১৯৫]

এসব কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন এবং তাকে ইসলাম ধর্মের একটি বড় অবদান হিসেবে গণ্য করেছেন। যা ধনী মুসলিমগণ থেকে গ্রহণ করে গরিব মুসলিমগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। যাকাত পেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি তার বৈষয়িক অভাব অনটন পূরণ করবে। যেমন: খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবে। সে সাথে বিয়ের ন্যায় জৈব-মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে। মনীষিগণ যাকে পূণাঙ্গ জীবনের জরুরি অংশ বলে গণ্য করেছেন। এমনিভাবে সে তার আত্মিক ও চিন্তা-গবেষণা ধর্মী প্রয়োজনও সম্পন্ন করতে পারবে। যেমন: যারা লেখা-পড়া করতে চায় কিন্তু অর্থের অভাবে তা চালিয়ে যেতে পারেনা তাদের বই-পত্র বা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে যাকাত অনন্য ভূমিকা পালন করে।[১৯৬]

ফকির বা দরিদ্র ব্যক্তির এ চেতনা যে-সে সমাজের অসহায় বা ধ্বংসশীল নয় এবং তাকে তার সমাজ গুরুত্ব দেয়, তাকে দেখা-শুনা করে-তার ব্যক্তিত্বের জন্য বড় অর্জন তার আত্মার জন্য পরিশুদ্ধকারী। এ অনুভূতিটুকুই সমস্ত উম্মাতের জন্য বড় সম্পদ যাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করা যায় না।[১৯৭]

"ইসলাম দারিদ্র্য ও লোকদের অভাব-অনটনকে ঘৃণা করে। কেননা ইসলাম চায় তাদের বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ হোক-যেন সে এর চেয়ে বড় ও জাতীয় ব্যাপার সমূহে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়-যা মানবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আল্লাহ্ বনী আদমকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। 'আমিতো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১৯৮]

যাকাত হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে

যাকাত হিংসা ও ঘৃণা প্রভৃতি রোগ থেকে যাকাত দাতা ও যাকাত গ্রহীতা উভয়কে মুক্ত করে। তাই কোন মানুষকে যদি তার দারিদ্র্যের দন্ত দংশন করতে থাকে, প্রয়োজনের আঘাত যদি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তার আশপাশের লোকেরা যদি মহাসুখে বাস করে, সে যদি তাদেরকে সম্পদের পাহাড় গড়তে দেখে,

---

১৯৫ মাশকালাতুল *ফাকরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৯৬ *ফিকহুয যাকাত*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৪-৭৫

১৯৭ *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৫

১৯৮ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا আল-কুর'আন, ১৭:৭০

Dhaka University Institutional Repository

তারা যদি তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে, তাকে যদি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তির মনে হিংসা-বিদ্বেষ কেন দানা বেধে উঠবে না? সে ঐ সমাজের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা কেন করবেনা? সে সে সমাজের কল্যাণের কোন চিন্তাই করতে পারে না।

ইসলামে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। সৌভ্রাতৃত্বের মূল কথা হল অভিন্ন মনুষ্যত্ব ও আকিদা বিশ্বাসের পরম ঐক্য ও একাত্মতা। ইসলামের আহবান: "তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১৯৯] "মুসলিম মুসলিমের ভাই।"[২০০]

কিন্তু এক ভাই যদি পেট ভরে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে এবং অন্য ভাই যদি ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে, ধনী ভাই যদি দরিদ্র ভাইয়ের অবস্থা দেখে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেয় তাহলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কখনই কায়েম থাকতে ও স্থায়ী হতে পারে না।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক

যাকাত নিঃসন্দেহে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক। সমাজের নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায়, পঙ্গু, বেকার ইত্যাদি লোকদের ক্রয় ক্ষমতা নেই বললেই চলে। যাকাত প্রাপ্তির পর তাদের সচ্ছলতা আসে এবং তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক তৎপরতা বেড়ে যায়।

যাকাত নির্ধারিত হক

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত একটি হক বা অধিকার অথবা বিত্তশালীদের ঘাড়ে দুর্বল এবং হকদার শ্রেণীর ঋণ। অনুরূপভাবে তা একটি নির্দিষ্ট হক অর্থাৎ যার পরিমাণ নির্দিষ্ট। যারা যাকাত দেয় এবং যারা যাকাত গ্রহণ করে তারা এ পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। আর এ হক নির্দিষ্টকারী হলেন সে সত্তা যিনি নিজের মুত্তাকী এবং নেককার বান্দাদের সম্পর্কে বলেছেন, "তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[২০১] অন্য সূরায় বেহেশতে ইজ্জত ও সম্মানের হকদার নেক বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের।"[২০২]

---

১৯৯ كونوا عباد الله اخوانا *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, বাব নং-৪৫

২০০ المسلم اخو المسلم *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররে, হাদীস নং-৫৮

২০১ وفي أموالهم حقٌ للسّائل والمحرُوم আল-কুর'আন, ৫১:১৯

২০২ والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ للسّائل والمحرُوم আল-কুর'আন, ৭০:২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনী দলীল

যাকাত সম্পর্কে কুর'আনের সুস্পষ্ট দলীল হল আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত আদায় ও বণ্টনের কাজ তত্ত্বাবধানকারীকে একত্রে এবং পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে 'আমিলীনা আলাইহা' বা 'যাকাত আদায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাকাতের সম্পদেই তাদের অংশ রাখা হয়েছে। তাদের জীবনযাপনের নিরাপত্তার জন্য অন্য মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তারা নিজেদের বেতন গ্রহণ করুক ইসলাম সেটাও চায়নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে তারা নিশ্চিত থাকে এবং নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২০৩]

আল্লাহ্র কিতাবের এ সুস্পষ্ট দলীলের পর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ঢিলেমী এবং চিন্তা ভাবনার কোন অবকাশ নেই। বিশেষ করে এর পর তো আর কোন অবকাশই থাকতে পারে না যখন উল্লিখিত আয়াতে যাকাত ও সাদাকার হকদারের শ্রেণী ও সীমা নির্ধারণকে "আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয বা নির্ধারিত" বলা হয়েছে। আল্লাহ্র তরফ থেকে আরোপিত সে ফরযকে বাতিল করার স্পর্ধা কে রাখে? আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে তওবাতেই যাকাত খরচের খাত উল্লেখ করে বলেছেন, "তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে, তাদের জন্য দোয়া কর, তোমার দোয়া তাদের প্রশান্তির কারণ হবে।"[২০৪]

এ আয়াতে উল্লিখিত সাদাকার অর্থ যাকাত। তা পূর্বের পরের সমস্ত মুসলিমের সম্মিলিত রায় এবং এখানে মহানবী (স.) কে এবং যারা পরবর্তীতে মুসলিমগণের নেতা হবেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করা হয়েছে।

নবীর সুন্নত

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে যে মশহুর হাদীস ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তাতে নবী করিম (স.) হযরত মু'আযকে (রা.) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাকে বলেছিলেন, "জেনে রাখ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণের উপর এক ধরনের সাদাকা ফরয করেছেন। এ সাদাকা তাদের বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীর এবং মিসকীনদের দেয়া হবে। তুমি ধনীদেরকে তা আদায়ের নির্দেশ দেবে। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের ভালো ও উত্তম মালও নেবে না এবং মযলুমের

---

২০৩ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم আল-কুর'আন, ০৯:৬০

২০৪ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم আল-কুর'আন, ০৯:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা মযলুম এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা থাকে না।" এ হাদীসের যে অংশকে আমরা দলীল হিসেবে পেশ করতে চাই তা হল ফরযকৃত সাদাকা এবং যাকাত সম্পর্কিত মহানবীর (স.) বাণী। তিনি বলেছেন, "যাকাত বিত্তবানদের কাছ থেকে নিয়ে ফকীরদের দেয়া হবে।" এথেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে একজন আদায়কারী যাকাত আদায় করে এবং একজন বণ্টনকারী তা গরীব ও মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে। যে ব্যক্তি এ ফরয আদায় করবে তার অনুমোদনের এখতিয়ারের উপরে ছেড়ে দেয়া যাবে না। শায়খুল হাদীস হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী' (শরহে বুখারী) গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "হযরত আলী (রা.) এ হাদীস থেকে দলীল দিয়ে বলেছেন, সমকালীন শাসকই যাকাত আদায় এবং তা ব্যয় ও বণ্টনের যিম্মাদার। এ কাজ সে স্বয়ং করুক অথবা নিজের কোন নায়িবের মাধ্যমে করাক এবং যে ব্যক্তি যাকাত দানে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে তা আদায় করতে হবে।"[২০৫]

এ গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ে যাকাত আদায়কারীদের সহযোগিতা করা জাতির বিত্তশালীদের আবশ্যিক কাজ হিসেবে পরিগণিত। তাদের উপর যত যাকাত ওয়াজিব তা আদায় করবে এবং যাকাতের মাল থেকে কোন বস্তু আদায়কারীদের কাছে তারা লুকিয়ে রাখবে না। রাসূলের (স.) এবং তাঁর সাহাবীদের এটাই নির্দেশ।

যাকাতের লক্ষ্য এবং সমাজ-জীবনে তার প্রভাব

যাকাতের সামাজিক সামষ্টিক লক্ষ্য স্পষ্ট অতীব প্রকট। এতে কোন সন্দেহ নেই। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের উপর চোখ বুলালেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার উপর এক তড়িত দৃষ্টিও আমাদের সম্মুখে এ মহাসত্য প্রতিবাদ করে তোলে যেমন রাতের অবসানে পৃথিবী চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে প্রত্যক্ষ হয়ে। সূরা তওবার এ আয়াতটি যখন আমরা পাঠ করি, "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্‌র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। তা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"তখন সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, দারিদ্র্য ও অভাব অনটন দূর করা বা সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাই যাকাতের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য।

যাকাতের প্রধান লক্ষ্য : দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা

যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার সামাজিক নিরাপত্তা। যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের (ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা, নও মুসলিম, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তা ও মুসাফির) মধ্যে চারটি খাতই (ফকীর, মিসকীন, দাসমুক্তি ও মুসাফির) সর্বহারা, অসহায়, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। এ খাতগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যাকাত কিভাবে দারিদ্র্য সহায়তা করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কায়েম করে।

---

[২০৫] আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী* (বয়রূত: লেবানন, দারুল মা'রিফা, তা.বি) খ. ৩, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

ফকির ও মিসকীন

যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে: ফকির ও মিসকীন। যাকাতের সম্পদে তাদের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ থেকেই যাকাত ব্যবস্থা প্রচলণের লক্ষ্য বোঝা যায়। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন স্থায়ী হতে পারে না। এর বড় প্রমাণ যাকাত ব্যয়ের খাত বিষয়ে কথা শুরু করে কুর'আন মাজীদ সর্বাগ্রে ফকীর-মিসকীনদের কথা বলছে। আরবী কথনরীতির নিয়ম হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার আগে বলা। দারিদ্র্য দূর করা ও ফকির-মিসকীনদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য। সে কারণে নবী কারীম (স.) কোন কোন হাদীসে শুধু এ কথাটিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত মুআ'যকে যখন ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাকে বললেন, 'তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তাঁদের গরিব লোকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে।"[২০৬]

কুর'আনের আয়াতে উল্লেখিত 'ফকির' ও 'মিসকীন' বলতে কাদেরকে বোঝায়? এরা কি দু'ই শ্রেণীর লোক না কি একই শ্রেণীর। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মালিকী মাযহাবের ইবনুল কাসেমের মতে এরা একই পর্যায়ের। কিন্তু জমহুর ফিকহবিদদের মতে-এরা আসলেই দু'ধরণের লোক-একই প্রজাতিভূক্ত। আর সে প্রজাতি হচ্ছে অভাব-অনটন লাঞ্ছিত জনগণ। একই আয়াতে একই প্রসঙ্গে শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে, তাৎপর্য নির্ধারণে এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ঠিক 'ইসলাম' ও 'ঈমান' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের মত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ দু'টি শব্দ এক স্থানে ব্যবহৃত হলে তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। তখন প্রতিটি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ হবে।

যে দরিদ্ররা গোপনে আত্মসম্মান রক্ষা করে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য

আমাদের মধ্যে একটা ধারনা বিদ্যমান যে, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করাকে নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা নিদেজের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতার কথা প্রকাশ করে বেড়ায়, সভাস্থল, বাজার ও মসজিদের দরজায় যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের হাত প্রসারিত করে দেয়, তারাই মিসকীন, তারাই দরিদ্র। প্রাচীণকাল থেকে মানুষের মনে এ ধারণাই বিদ্যমান। এমনকি রাসূল (স.)-এর যামানায়ও লোকদের অন্তরে এ ধারনা বদ্ধমূল ছিল। তাই তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করে দিয়ে প্রকৃত অভাবী ও মিসকীন এর পরিচয় তুলে ধরেছেন যারা সত্যিকার অর্থে সমাজের সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। রাসূল (স.) এ ব্যাপারে বলেছেন,

"সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটি খেজুর বা দু'টি খেজুর অথবা এক মুষ্ঠি বা দু'ই মুষ্ঠি খাবার ফিরিয়ে দেয়। প্রকৃত মিসকীন সে ব্যক্তি যে আত্মসম্মানের কারণে ভিক্ষা করে না। তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার: 'যারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না'।"[২০৭] অর্থাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা দিতে

---

২০৬ أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤ خذمن اغنيائهم فترد على فقر انهم সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-১

২০৭

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের বাধ্য করে না। চূড়ান্তভাবে ঠেকে না গেলে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে চায় সে মানুষদেরকে দিতে বাধ্য করে এবং কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় সে মিসকীন নয়। এর দ্বারা ঐ সকল মুহাজিরদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছে। এদের ধন-সম্পদও আয়-উপার্জন কিছুই নেই, যা দ্বারা তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।[২০৮] এ সকল লোকের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; যাতনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাতনা করে না।"[২০৯]

এ মিসকীনই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। যদিও এ মিসকীন সম্পর্কে লোকেরা উদাসীন থাকে। এজন্যই রাসূল (স.) এ ধরনের লোকদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের তালাশে মানুষদেরকে বুদ্ধি-বিবেক নিয়োগ করতে বলেছেন। অনেক ঘরের অধিবাসীরা, অসংখ্য আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এভাবে নিরবে-নিভৃতে নিঃস্ব জীবন যাপন করছে। এদেরকে খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিলে তারা অভাবমুক্ত হতে পারে। এরা অনেকেই অবস্থার দুর্বিপাকে পড়ে গেছে বা অক্ষমতা তাদেরকে দরিদ্র বানিয়েছে। অথবা সন্তান-সন্ততি বেড়ে গেছে কিন্তু তাদের সম্পদ কমে গেছে। অথবা তাদের উপার্জন তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

যাকাত থেকে ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ দেয়া যাবে ?

ফকীর ও মিসকীনকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

ক. জীবনকালের প্রয়োজন পরিমাণ দান: এ মত অনুযায়ী ফকীরকে এতটা পরিমাণ দান করতে হবে, যার দ্বারা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। তার অভাব-অনটন দূর হওয়ার কারণ ঘটে এবং স্থায়ীভাবে তার প্রয়োজন যথেষ্ট মাত্রায় পূরণ হতে পারে। দ্বিতীয়বার সে যেন যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষী না হয়। ইমাম নববী বলেছেন, ইরাকী ও অধিকাংশ খোরাসানী ফকীহ বলেছেন, ফকীর-মিসকীনকে এত অধিক পরিমাণ দিতে হবে যা তাদেরকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত করে ধনাঢ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইমাম শাফি'য়ী নিজেও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা তাদের মতের স্বপক্ষে কুবাইচা ইবনুল শাখারিক আল হিলালী বর্ণিত একটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হল, রাসূল (স.) বলেছেন, "তিনজনের যে কোন একজনের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ।

---

২০৮ হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআ'নুল আযীম* (মিসর: দারুত তাক্বওয়া, সন নেই), খ. ০১, পৃ. ৩২৪

২০৯ ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩২৪

২০৯ للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا-আল-কুর'আন, ০২:২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

একজন, যার উপর এমন বোঝা চেপেছে যে, তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হয়ে গেছে, যতক্ষণ সে সেই পরিমাণ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে ভিক্ষা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি যে, বড় দুর্নিবাতের বা দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারজন্য ভিক্ষা বৈধ, যতক্ষণ না সে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাত্রার মালিক না হচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি যে, অনশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এমনকি তার কাওমের লোকদের মধ্য থেকে অন্তত তিনজন বলতে শুরু করেছে যে, অমুক ব্যক্তি না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা বৈধ। যতক্ষণ না সে তার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ফিরে আসে। হে কুবাইচা এ তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য ভিক্ষা করা ঘুষ ছাড়া কিছুই নয়। এরা ব্যতীত অন্য যে কেহ ভিক্ষা করে সে ঘুষ খায়।"[২১০]

অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নবী কারীম (স.) ভিক্ষার অনুমতি দিয়েছেন। যদি সে উপার্জন করার মত কোন পেশা অবলম্বন করতে চায়, তাহলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি তাকে ক্রয় করে দিতে হবে। তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক। যার দ্বারা সে এ পরিমাণ আয় করতে পারে যে, তার প্রয়োজন যথা সম্ভব পূরণ হয়। তবে স্থান, কাল ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পেশা ভিন্ন হতে পারে। যে শাক-সবজি বিক্রয় করতে পারে, তাকে পাঁচ বা দশ দিরহাম দেয়া যেতে পারে। আর যে লোকের পেশা হীরা-জহরত ও স্বর্ণ-রৌপ্য বিক্রয় তাকে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে, যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ আয় করা না যায়। আর যে ব্যবসায়ী, রুটি প্রস্তুতকারী, বা আতর প্রস্তুতকারী বা মুদ্রা বিনিময়কারী তাকে সে অনুপাতে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। যে দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, কসাই বা কোন শিল্পকর্মে পারদর্শী তাকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে। যদি সে কৃষিজীবি হয়, তাহলে তাকে এমন পরিমাণ জমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যেখানে সে ফসল ফলিয়ে চিরজীবন স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে বেঁচে থাকতে পারে। যদি সে এ ধরনের পেশা গ্রহণে সক্ষম না হয়, কোন শিল্পদক্ষতারও অধিকারী না হয়, ব্যবসা বা অন্য কোন উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে তার বসবাসের স্থানের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহের আয়ুস্কালীন ব্যবস্থা করে দিতে হবে।[২১১]

খ. এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে: মালিকী, হাম্বলী ও অন্যান্য মতের সাধারণ ফিকহবিদগণের মতে, ফকীর ও মিসকীনকে যাকাত থেকে এ পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যা তার ও তার উপর নির্ভরশীল লোকদের একবছরের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়াকে সমর্থন করেন না। আবার একবছরের প্রয়োজনের পরিমাণের কম দেয়াকেও তারা যৌক্তিক মনে করেন না। তারা একবছরের সীমা এজন্য দেন যে, একজন ব্যক্তি সাধারণত তার ও তার পরিবারের সদস্যদের একবছরের জীবিকার নিরাপত্তা চেয়ে থাকেন। রাসূল (স.) এর অনুসৃত নীতিতেও এর উত্তম আদর্শ বা

---

২১০ لاتحل المسئلة الا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت ياكلها صاحبها سحت *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬-৩৭, হাদীস নং-৪৭৭

২১১ *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেননা সহীহ সূত্রে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স.) তাঁর পরিবারের জন্য একবছরের খাবার মওজূদ করে রাখতেন।[২১২]

তাছাড়া যাকাতের মাল তো সাধারণত বাৎসরিক হিসেবে প্রদান করা হয়। কাজেই সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। প্রতি বছর যাকাতের খাতে নতুন নতুন সম্পদ আসবে সেখান থেকে উপযুক্ত লোকদের মাঝে বার্ষিক হিসেবে বণ্টন করা হবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে, এ নীতির আলোকে ফকীর ও মিসকীনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণের পূর্ণ মাত্রার বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই ইসলামের আলিমদের চিন্তা করতে হবে যে, খাদ্য, পানীয়, বস্ত্রই কেবল মানুষের জীবন পূর্ণত্ব পেতে পারে না। যে চাহিদা পূর্ণ করার মাধ্যমে মানুষ পরিতৃপ্তি লাভ করে। আর তা হচ্ছে প্রজাতি সংরক্ষণ ও যৌন প্রবণতা চরিতার্থকরণ। পৃথিবী আবাদ করার জন্য এবং বংশ সংরক্ষণে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য যাকে আল্লাহ্ তা'আলা চাবুক হিসেবে বানিয়েছেন, যা মানুষকে সেই লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ও স্বভাবজাত ভাবধারার প্রতি কোনরূপ উপক্ষো প্রদর্শণ করেনি; বরং তাকে সুসংগঠিত করেছে এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলার জন্য নিয়ম-কানূন ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

অপরদিকে ইসলাম বিবাহবিহীন জীবন যাপন করতে, বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করতে ও পুরুষত্ব হনন করতে নিষেধ করেছে। মানুষের যৌন শক্তি দমনের কোন চেষ্টা ও চিন্তাকে ইসলাম সমর্থন করেনি বরং সামর্থ্যবান যুবকদের বিবাহ করার নির্দেশ দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করেছে, "হে যুব সম্পদায়! তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক ও আর্থিকভাবে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে, কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে অধিক অবনমিত রাখে, এবং যৌনাঙ্গকে অধিক সংরক্ষণ করে।"[২১৩]

অতএব সমাজের বিবাহে ইচ্ছুক নর-নারী মহরানা ইত্যাদি দিতে আর্থিকভাবে অক্ষম হলে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। এ কারণে আলিমগণ বলেছেন, ফকীর মিসকীন যদি অবিবাহিত হয় এবং তাদের বিবাহের যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তাদের বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেয়া তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত দেয়ার অন্তর্ভুক্ত কাজ।[২১৪]

---

২১২ বুখারী ও মুসলিম, উদ্ধৃত, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭।

২১৩ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, বাব নং ২।

২১৪ *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

Dhaka University Institutional Repository

'উমর ইবন আবদুল আযীয লোকদের মাঝে ঘোষণা দেয়ার জন্য ঘোষণাকারীকে একথা বলতে নির্দেশ দিয়েছে যে, "মিসকীনরা কোথায়? ঋণগ্রস্তরা কোথায়? এবং বিবাহকারীরা কোথায়? অর্থাৎ বিবাহেচ্ছুকগণ কোথায়?"[২১৫]

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের ধর্ম। ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল কুর'আন হল বিজ্ঞানময়। আল্লাহ সূরা ইয়াসীনের শুরুতে কুর'আনকে বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। "ইয়া-সীন, শপথ বিজ্ঞানময় কুর'আনের।"[২১৬] ইসলাম মানুষকে 'ইলম শেখার আহবান জানিয়েছে, বিদ্বান লোকদের মর্যাদা অনেক উচুতে তুলে ধরেছে। ইসলাম 'ইলমকে ঈমানের চাবি মনে করে এবং আমলের দলীল মনে করে। ইসলাম অন্ধ অনুসরণকারীর ঈমান ও মুর্খ ব্যক্তির 'ইবাদাত কে গণ্য করে না। কুর'আন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?"[২১৭] রাসূল (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অন্বেষণ করা ফরয।"[২১৮]

নিজের জন্য ঋণ গ্রহণকারীকে সাহায্য দেয়ার শর্ত

এ প্রকার ঋণ গ্রহণকারীকে চারটি শর্তে ঋণ-পূরণ পরিমাণ সাহায্য দেয়া যাবে। শর্ত চারটি হল:

১. ঋণ পরিশোধ করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন থাকতে হবে। সে যদি ধনী হয়, নগদ টাকা ও জিনিস পত্র দিয়ে তা শোধ করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে যাকাত থেকে কোন অংশ দেয়া যাবে না। যদি ঋণের কিছু অংশ শোধ করার মত টাকা তার থাকে তাহলে তাকে অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ পরিমাণ টাকা দেয়া যাবে। যদি সে কোন কিছুর মালিক না হয়, কিন্তু কাজ ও উপার্জনের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে সক্ষম হয় তাহলেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা কাজ বা উপার্জন করে পরিশোধ করতে অনেক সময় লাগবে, এ সময়ের মধ্যে ঋণ শোধের প্রতিবন্ধক কোন কিছু ঘটতে পারে।

২. লোকটি এমন হতে হবে যে, সে ঋণ করেছে আল্লাহর বন্দেগী পালন বা কোন মুবাহ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। যদি সে কোন পাপের কাজ করার জন্য ঋণ করে থাকে যেমন: মদপান, ব্যভিচার, জুয়া, হাস্য-কৌতুক, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের হারাম কাজ, তাহলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে নিজের ও পরিবারের জন্য ব্যয় করার সময় যদি সে অপচয়-অপব্যয় করে থাকে তাহলে তাকে ঋণ দেয়া যাবে না। যদিও সে অপচয় কোন মুবাহ পর্যায়ের কাজেও হয়। কেননা মুবাহ

---

২১৫ اين المساكين ؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ اى الذين يريدون الزواج *বিদায়া নিহায়া*, উদ্ধৃত. ফিকহুয যাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯

২১৬ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون আল-কুর'আন, ৩৬:০১

২১৭ طلب العلم فريضة على كل مسلم আল-কুর'আন, ৩৯:০৯

২১৮ *সুনানু ইবন মাজা*, মুকাদ্দামা, বাব নং-১৭, হাদীস নং-২২৪

Dhaka University Institutional Repository

কাজে ঋণ হয়ে যাওয়ার পরিমাণ অপচয় করা মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[২১৯] পাপ কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণকারীকে যাকাত দেয়া যাবে না এ কারণে যে, তা দিলে আল্লাহর নাফরমানীর কাজে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহর সীমালঙ্ঘনে তার অনুসরণ করতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

৩. ঋণটা সাম্প্রতিক হতে হবে। ঋণ যদি দীর্ঘদিনের হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে কি না? তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে। কেননা সে তো 'গারিমুন' বা ঋণগ্রস্ত। কুর'আনের আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেছেন: দেয়া যাবে না। কেননা বর্তমানে সে ঋণ আদায়ে বাধ্য নয়। কেউ বলেছেন, যদি ঋণের মেয়াদ সে বছরই শুরু হয়, তাহলে দেয়া যাবে, অন্যথায় সে বছরের যাকাত থেকে তাকে দেয়া যাবে না।

৪. ঋণটা এমন হতে হবে যার জন্য ঋণগ্রহীতাকে বন্দি করা যায়। তবে কাফ্ফারা ও যাকাত না দেয়ার দরুন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হলে তা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেনা। কেননা যে ঋণের কারণে ব্যক্তিকে বন্দি করা যায় তা হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋণ। যাকাত ও কাফ্ফারা হল আল্লাহর ঋণ। এগুলো হল মালেকী মাযহাবের মত। সকল ফিকহবিদ এ শর্তগুলো আরোপ করেননি। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যে ঋণের দাবি মানুষের পক্ষ হতে করা হয় এমন প্রত্যেক ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।[২২০]

দ্বিতীয়ত ঃ অন্যের কল্যাণে বা সমাজ-সমষ্টির কল্যাণে ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি

ঋণগ্রস্তদের দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, সমাজের এমন এক শ্রেণী যারা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সম্মানিত, যারা বড় হৃদয়বান, উদার ও দৃঢ়তাসম্পন্ন। আরব এবং ইসলামী সমাজেই এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। এরা পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে নেমে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, একটি বিশাল জনসমষ্টির দু'টি গোত্র বা দু'গ্রামের লোকেরা রক্তপণ ও ধন-সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। এর কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তখন একজন অগ্রসর হয়ে বিবদমান জনসমষ্টির মাঝে সন্ধি করিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। সে সময় সে বিবাদের অগ্নি নেভানোর জন্য পারস্পরিক বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু কোন ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিজের যিম্মায় নিয়ে নেয়। এটা অনেক কাল যাবত পরিচিত একটি প্রথা। এরূপ অবস্থায় যিম্মার বোঝাটা যাকাতের 'গারিমূন' এর খাত থেকে বহন করা যাবে যেন সমাজের সংশোধন প্রয়াসী কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দ নিজেদের উপর এ বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিষ্পিষ্ট হতে বাধ্য না হন কিংবা তদ্দরুন তাদের সংশোধন সংকল্পও ব্যাহত ও পর্যুদস্ত না হয় অথবা তার প্রতি অনীহা ও অনুৎসাহের সঞ্চার না হয়। এ কারণে ইসলামী শরী'আত ব্যাপারটিকে এভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা দিয়েছে। এদের জন্য যাকাতের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

---

[২১৯] يابنى ادم خذوا زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين আল-কুর'আন, ০৭:৩১

[২২০] *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫-৬২৬

Dhaka University Institutional Repository

জনসমষ্টির পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসায় সে লোকেরাও পড়বে যারা সামষ্টিক শরী'আত সম্মত ভাল কাজের জন্য দায়িত্ব সহকারে কাজ করবে। যেমন, ইয়াতীমদের জন্য প্রতিষ্ঠান, গরীবদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, নামায প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ, মুসলিমগণের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন মাদ্রাসা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কল্যাণময় বা সামষ্টিক খিদমতের কাজ প্রভৃতি। এসব কাজের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 'গারিমূন' শব্দ দ্বারা কেবল পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসাকারী লোকদেরই বোঝতে হবে অন্য কেউ তার মধ্যে শামিল হতে পারবে না, এমন কথা শরী'আত থেকে জানা যায় না। 'তারা যদি 'গারিমূন' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাও হয় তবুও 'কিয়াস' এর সাহায্যে এ বিধান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তার অর্থ যে লোক উক্তরূপ সামষ্টিক কল্যাণকর কাজ করার দরুন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সে ধনী হলেও তাকে যাকাত ফাণ্ড থেকে তার ঋণশোধ পরিমাণ টাকা অবশ্যই দিতে হবে। প্রথম প্রকারের লোকেরা যখন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তাহলে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাতো অধিক উত্তমভাবে সাহায্য পাওয়াব যোগ্য। কেননা তারা সামষ্টিক কল্যাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে।[২২১]

আবূ দাউদ নবী কারীম (স.) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "যাকাত ধণি লোকের জন্য বৈধ নয়। তবে পাঁচজনের (যদিও তারা ধনী) জন্য বৈধ। পাঁচজন হল: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, যাকাতের কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কেউ যদি স্বীয় মালের বিনিময়ে তা (যাকাত) ক্রয় করে নেয়, এমন ব্যক্তি যার মিসকীন প্রতিবেশী ছিল, সে মিসকীনকে যাকাত দিয়েছে, অতঃপর সেই মিসকীন ব্যক্তি কোন ধনীকে হাদিয়া (উপহার) হিসেবে দিয়েছে (এ ধনী ব্যক্তির জন্য তা বৈধ)।[২২২]

হাদীসের কথা 'যে ব্যক্তি বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে' فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك 'তার জন্য ভিক্ষা বৈধ যতক্ষণ না সে বিপদ থেকে মুক্ত হয়, অতঃপর সে আর ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকবে।' এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সে লোক ধনী। কেননা ফকীর ব্যক্তির জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত ভিক্ষা থেকে বিরত থাকার প্রশ্ন উঠে না।

বস্তুত পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন, শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপন বা রক্ষা করার জন্য ঋণগ্রস্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে সাহায্যের হাত প্রশস্ত করা ইসলামের এক বিশেষ অবদান। বিপদগ্রস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, তাদের হাত শক্তভাবে ধরা, যেন তারা পতিত অবস্থা থেকে উঠে দাড়াতে পারে,

---

[২২১] *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০-৩১

[২২২] لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم او لرجل إشتر اها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغنى *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং -২৫

Dhaka University Institutional Repository

এটাও শুধুমাত্র ইসলামের সুমহান অবদান। জিনিসপত্র, পণ্যদ্রব্য, জীবন ইত্যাদির উপর দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের ক্ষেত্রে বিমা ব্যবস্থা চালুর কয়েক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া এর সাথে পরিচিত হয়েছে কেবল ইসলামের বদৌলতে। অর্থাৎ ইসলাম এসব বিপদগ্রস্ত লোকদের রক্ষার বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। অতএব, যে দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষুধার্ত অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে অন্তত তিনজন লোক সাক্ষ্য দেবে, তারই জন্য দয়াভরা দু'টি বাহু প্রশস্ত করে দেয়ার শিক্ষা একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলামের এ অবদানের উপর আরো বড় অবদান হচ্ছে, যাকাত দেয়ার চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হচ্ছে, গরিব লোকটির জীবনমানে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়া, সুখী জীবনের ব্যবস্থা করা, তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। যার ফলে সত্যিকার অর্থেই সে নিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারবে। কেবল কয়েক মুষ্ঠি খাবার দিয়ে তার মেরুদন্ড খাড়া রাখাই ইসলামের লক্ষ্য নয়।

যাকাত থেকে 'করযে হাসানা' দেয়া

যাকাতের টাকা 'করযে হাসানা' হিসেবে দেয়া যাবে কি না? যদি 'করযে হাসানা' প্রার্থীদের ঋণগ্রস্তদের মতই মনে করা হয়? ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর মতে, যাকাত পর্যায়ের সহীহ কিয়াস ও ইসলামের সাধারণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে 'গারিম' দের জন্য নির্দিষ্ট যাকাত অংশ থেকে ঠেকায় পড়া লোকদের 'করয' দেয়া সম্পূর্ণ জায়িয। তবে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ফাণ্ড গঠন করতে হবে। সুদী কারবার প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থাস্বরূপ যাকাতকে এভাবে বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা 'করযে হাসানা' দান সুদী কারবারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবূ জুহরা, খাল্লাফ ও হাসান এ তিনজন আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ যাকাত সম্পর্কে উপরিউক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, ভাল কাজের জন্য গৃহীত ঋণ যদি যাকাতের টাকা থেকে আদায় করা যায়, তাহলে সুদমুক্ত ঋণ 'করযে হাসানা' তা থেকে আরো উত্তমভাবে করা যাবে। যা শেষ পর্যন্ত বায়তুলমালে ফিরে আসবে।[২২৩]

ঋণগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তা

লোকদের যাকাতের মালে 'গারিমুন' এর জন্য যে অংশটি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা পাওনাদারদের ঋণের এ বোঝা খতম করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌র নির্ধারণ বিশেষ। ইসলামী আইন প্রণয়ন ও তার পদ্ধতি এটাই। ইসলাম ঋণগ্রস্তদের গলদেশ ঋণের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। তাকে ধ্বংসের অতল তল থেকে উদ্ধার করতে চায়। ঋণের কারণে তাকে নিঃস্ব, নির্যাতিত অবস্থায় ফেলে রাখতে চায় না, চায়না ব্যক্তি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করুক। ইসলাম ভিন্ন দুনিয়ার অপর কোন সমাজ-বিধান ঋণগ্রস্ত

---

২২৩ *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকদের ঋনের বোঝার কঠিন দুঃখের চাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এরূপ কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে জানা যায় না। এটা কেবল মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।

ইসলাম যাকাতের মাল থেকে বৈধ কাজের জন্য ঋণগ্রস্ত লোকদের এ ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করেছে দু'টি বিরাট লক্ষ্যেঃ

প্রথম: ইসলামের সম্পর্ক ঐ ঋণগ্রস্তের সাথে ঋণ যাকে নুইয়ে ফেলেছে বা কাবু করে ফেলেছে। ঋণের কারণে রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের লজ্জা তার উপর আরোহন করেছে। ঋণ ফেরত দেয়ার দাবি ও চাপের কারণে সে এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। পাওনাদারের মামলার কারণে সে বন্দিত্ববরণকরা সহ নানাবিধ জটিল ও কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। ইসলাম এ ব্যক্তির ঋণ আদায় করে তাকে চিন্তামুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় : ইসলাম সম্পর্কিত ঋণ দাতার সাথে যে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়েছে এবং শরী'আত সম্মত কাজে তাকে সাহায্য করেছে। ইসলাম যখন তার প্রাপ্য ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করে, তখন সে সমাজের লোকদের মানবতাবোধ তথা সহানুভূতিপূর্ণ আচার-আচরণ, সাহায্য-সহযোগিতা, করযে হাসানা ইত্যাদিতে উৎসাহিত করে। এ দিক থেকে যাকাত সুদী কারবারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম।

জাহিলিয়াত যুগে আরব সমাজে এ বিধানই পরিচিত ও ব্যাপকভাবে কার্যকর ছিল। ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিকে ধরে ক্রীতদাস বানিয়ে বিক্রয় করা হত ঋণদাতার পাওনা হিসেবে। কারো কারো মতে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় এ প্রথা চালু ছিল। পরে অবশ্য তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঋণদাতার পক্ষে ঋণগ্রস্তব্যক্তিকে ক্রীতদাস বানাবার আর কোন রাস্তা থাকেনি।[২২৪] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যদি (খাতক) অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"[২২৫]

নও মুসলিম

নও মুসলিমের মনজয়ের খাতটি যদিও ধনী-গরিব নির্বিশেষে নবদীক্ষিত সকল মুসলিমের জন্য উন্মুক্ত তথাপি এখানেও সাময়িক আর্থিক অভাবে পীড়িত নওমুসলিম থাকতে পারে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় বলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তবেই তারা ইসলামে স্থির ও অটল হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। কেননা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি তার পূর্বতন ধর্ম ত্যাগ করেছে, তার পিতা-মাতা ও বংশ-পরিবারের নিকট তার প্রাপ্য ধন-মালের দাবি প্রত্যাহার

---

২২৪ ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লিআহকামিল কুর'আন* (বয়রূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫), খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

২২৫ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون আল-কুর'আন, ০২:২৮০

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তার বংশের বহু লোকই তার সাথে শত্রুতা করা শুরু করে দেবে, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে তার জীবিকার সব পথ ও বন্ধ বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে নিঃস্ব, সহায় সম্বলহীন হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবেও যাকাত ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করে। এরূপ দুনিয়ার স্বার্থ ত্যাগকারী ও আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গকৃত ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিকট থেকে বিপুল উৎসাহ ও সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এসব দরিদ্র জনগণের স্বাচ্ছন্দ অর্জন এবং স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা দানই যাকাতের অন্তর্নিহিত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবি (র.) যাকাতের বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে এভাবে তুলে ধরেন, "যাকাত দু'টি লক্ষ্যে নিবেদিত: আত্মশৃংখলা অর্জন ও সামাজিক দারিদ্র্য নিরসন। ধন-সম্পদ কৃপণতা, স্বার্থপরতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। ব্যক্তির ধন-সম্পদের ঐচ্ছিক বিতরণ এর উত্তম প্রতিষেধক। তা কৃপণতা নির্মূল ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করে। তা সামাজিক সংঘাতকে নিরসন করে মানুষে মানুষে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক উন্নত নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি রচনা করে। যাকাত সামাজিক সাম্প্রদায়িক দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে ফলদায়ক শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। কারণ নিরাপদ পৌরকাঠামো একটি সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। বস্তুত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হতে পারে। রাষ্ট্রকেই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব রাষ্ট্র তখনই সন্তোষজনকভাবে পালন করতে পারবে, যখন প্রচলিত সরকারি রাজস্বের সাথে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ধনীলোকদের নিকট থেকে যাকাত হিসেবে আসবে।"[২২৬]

যখন আমরা সূরা তওবার ৬০ নং আয়াত তিলাওয়াত করি তখন আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যাকাতের লক্ষ্যসমূহের একটা দীনি রাজনৈতিক রূপ রয়েছে। কেননা তা দীন ও রাষ্ট্র হিসেবেই ইসলামের সাথে মিলিত হয়। যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করতে হবে এবং আল্লাহর পথে প্রধানত এ দু'টি অংশই সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে।

এ দু'ই ব্যয়খাত দাবি করছে, দীন-ইসলাম একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান, এ রাষ্ট্র যাকাতসমূহ ধন-মালের মালিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে তার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে। পরে তা ব্যয় করা হবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও তার কালেমার বিস্তার সাধনের কাজে, তার ভূমিকা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আর তা হবে লোকদের হৃদয় আকৃষ্টকরণ এবং জাতিসমূহকে সেদিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা। কেননা আল্লাহর পথের দিকে রয়েছে ইসলামের উদাত্ত আহবান।এখানে আমরা আলোচনা করব 'মুসলিম সমাজ ও ইসলামী উম্মতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সাথে যাকাতের সম্পর্ক।

---

[২২৬] Mirza Mohammad Hossain: Islam and socialism, উদ্ধৃত, মোঃ আবুল কাশেম ভূইয়া, *সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬), পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত মূলত আর্থিক ইবাদত হলেও এর উপযোগিতা ও তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। যাকাত একজন মুসলিমের ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক উন্নতি সাধন করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে। নিয়মিত যাকাত প্রদানে পূণ্য বা সওয়াব বৃদ্ধি পায়, পাপ বা গুনাহ মিটে যায়, সম্পদের পরিশুদ্ধতা আসে, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যাকাত, দাতার অনুগ্রহ বা করুণা কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব এবং গ্রহীতার হীনমন্যতা বোঝায় না। বরং তা গ্রহীতার অধিকার।

যাকাত স্বাভাবিক সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুষ্ঠু কাঙ্খিত অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পদের যথাযথ বন্টনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উপর রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকে বিধায় বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালক শক্তির হাতে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এখানেও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীই যাচ্ছেতাইভাবে সম্পদকে ভোগ করে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ তথা সর্বহারারা তাদের ন্যায্য আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তারা একনায়কত্বের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দুর্বিসহ দিনাতিপাতে বাধ্য হয়।

বলাবাহুল্য ইসলামী রাষ্ট্র ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বিশেষত অসহায়, নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্তদের অভাব নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া বিধবা, পঙ্গু, কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ ও অসহায় শিশুদের ভাতা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। কর্মক্ষম ও যোগ্য ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ইসলামী রাষ্ট্রের এসব দায়িত্ব বিশেষ সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতকে বেছে নেয়া হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে যাকাত বন্টন সংক্রান্ত কাজগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারেঃ

এক. যাকাত ফান্ড থেকে দুস্থ নারী-পুরুষ, গরীব, পঙ্গু, কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ, এতিম এবং এ ধরণের অসহায় ও অভাবী লোকদের নিয়মিত স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থাকরণ যাতে তারা সবাই মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পুরণে সক্ষম হয়।

দুই. কর্মে সক্ষম অভাবী জনগোষ্ঠীকে পূনর্বাসন করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

তিন. পথিক ও প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চার. সঙ্গতকারণ সাপেক্ষে ঋনী ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত হয়ে মানবোচিত জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা।

পাঁচ. দরিদ্র লোকদের পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ছয়. গরীব ও সর্বহারাদের পরিবার-পরিজনদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসদন প্রতিষ্ঠান করা।

সাত. গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

আট. ইসলামী জীবন বিধান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

নয়. বেকারদের নিয়মিত ভাতা প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দশ. বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সাহায্য পুনর্বাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[২২৭]

ইসলাম হল দীনে ফিতরাত বা স্বভাবজাত জীবন বিধান। এর বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন শুধু তাত্ত্বিক নয় বরং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাচার ও তার সঙ্গীদের কাজ-কর্মে তা প্রাজ্জল। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সমাজের দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর 'সামাজিক নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার জন্য যাকাতের বিধান নাযিল করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিঃস্ব, বঞ্চিত, অসহায়, সর্বহারাদের অধিকার রক্ষায় তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে শোষক শ্রেণীকে পরাস্ত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে সাথে নিয়ে এ শক্তিশালী শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গরীবদের হক প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে যাকাত দারিদ্র্য-বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) এ অসহায় শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নে নিজে সারাদিন প্রশাসনিক কাজ করে রাতের বেলা নিদ্রা ত্যাগ করে ঘুরে বেড়াতেন। নিজে আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে অভাবী পরিবারে পৌছে দিতেন। পরবর্তীতে পঞ্চম খলীফা হযরত 'উমর ইব্ন আব্দুল আযীযের সময় অবস্থা এমন হল যে, যাকাত নেয়ার মত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এ প্রসংগে ড. হাম্মুদাহ আবদালাতি বলেন: It is authentically reported that there were times in the history of Islamic administration when there was no person eligible to receive Zakah; every subject Muslim, Christian and Jew of the vast Islamic empire had enough to satisfy his needs and the rulers had to deposit the Zakah collections in the public treasury.[২২৮]

---

[২২৭] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন: *যাকাত কি ও কেন* (ঢাকা: ইসলামিক ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৯-২০

[২২৮] Hammudad Abdalati, *Islam in focus, p. 97*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুলমাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত ঃ 'রাষ্ট্রীয় কোষাগার' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'বায়তুলমাল' বলতে সরকারের অর্থ-বিভাগীয় কর্মকাণ্ডকে বুঝায়না, পুঞ্জিকৃত ধন-সম্পদকেই বলা হয় 'বায়তুলমাল'। ইসলামি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই ইহা সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। বায়তুলমালের সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্মিলিত সম্পদ।

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। কি রাষ্ট্র-প্রধান, কি সরকারি কর্মচারি বা সাধারণ মানুষ, উহার উপর কাহারও একচেটিয়া বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইতে পারেনা। নবি করিম (স.) বলেন, আমি তোমাদিগকে দান-ও করিনা, নিষেধও করিনা, আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে, আমি সেইভাবেই জাতীয় সম্পদ বণ্টন করিয়া থাকি।

বায়তুলমাল হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগার, যেখানে নির্ধারিত আয় দরিদ্র্য, অভাবীদের অভাব দূরীকরণে সুপরিকল্পিতভাবে বণ্টন করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদ এবং সে সরকারি ধন-সম্পদ যার ব্যবস্থাপনা সরকার করে থাকেন ও যার আয় বায়তুলমালে জমা হয় তার ব্যয়ে এ নীতি অবশ্যই পালন করা হয়, কারন সম্পদ যেন শুধু বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। বায়তুলমালের মুনাফা ইনসাফের সাথে বণ্টন করতে হবে এবং সমাজের বিভিন্ন উঁচু-নীচু মানুষকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যদি যাকাত অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে সরকারের অন্যান্য আয় থেকে তাদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাকাত থেকে প্রাপ্ত আয়ই বায়তুল মালের আয়ের প্রধান উৎস।

বায়তুলমালের সংজ্ঞা

বায়তুলমালের অর্থ হলো সরকারি কোষাগার বা 'খাযানা'। যেখানে যাকাতসহ অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত আয় জমা রাখা হয়। কিন্তু এর দ্বারা শুধু সে ইমারতকেই বোঝায় না, যেখানে সরকারি ধন-সম্পত্তির কাজ-কারবার পরিচালনা করা হয়, বরং ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা সাধারণ সম্পদকে বোঝায়। বায়তুলমালকে সমগ্র মুসলমানের সাধারণ সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। যেমন হিদায়ায় বলা হয়েছে, "বায়তুলমালের সম্পত্তি মুসলিম জনসাধারণেরই সম্পত্তি।"[২২৯]

---

[২২৯] مال بيت المال مال عامة المسلمين শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল আলী ইবন আবূ বকর, *আল-হিদায়া* (করাচী: কালাম কোম্পানী, তা.বি.), খ. ০৪, পৃ. ০১

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় মালে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারি বা সাধারণ মানুষ কেউই একচেটিয়া তার মালিক হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণীতে সে কথাই ঘোষিত হয়েছে,

"আমি তোমাদের দানও করি না, নিষেধও করি না, আমিতো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে আমি জাতীয় সম্পদ সেভাবেই দিয়ে থাকি।"[২৩০]

বায়তুলমালের সূচনা

মদীনায় মহানবী হযরত (স.) এর পবিত্র হাতে প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় মূলত সেদিন থেকেই বায়তুলমালের সূচনা হয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনরূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হত না। তার সুযোগও তখন ছিল না। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয় ছিল অতি সামান্য। ফলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাতে কোন সম্পদ আসার সাথে সাথেই তিনি তা অভাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম (স.) এর যুগে বাহরাইন, ইয়ামান এবং আম্মান থেকে জিযিয়া, খারাজ প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ আদায় করা হত সেগুলো কোন কোষাগারে না রেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।

"সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর আমলে 'বায়তুলমাল' বাস্তব রূপ লাভ করে এবং হযরত আবূ 'উবায়দা (রা.) কে তার পরিচালক বা ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনও জাতীয় প্রয়োজনের তীব্রতা হেতু যে মাল-সম্পদই তাঁর কাছে আসত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা মুসলমানদের মঙ্গলার্থে ব্যয় করে ফেলতেন। এ কারণেই তখনকার বায়তুলমালের দরজা সব সময় তালাবন্ধ থাকত। হযরত আবূ বকর (রা.) এর ওফাতের পর যখন হযরত 'উমর (রা.) কয়েকজন সাহাবীর সাহায্যে বায়তুল মালের হিসাব নিকাশ নেন তখন তিনি তা একদম শূন্য দেখতে পান।"[২৩১]

হযরত 'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে যখন মিসর এবং 'ইরাক থেকে খারাজ (ভূমিকর) প্রভৃতি আসতে শুরু করে, তখন তিনি কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলোতে যথারীতি 'বায়তুলমাল' এবং তার শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত 'উমর (রা.) আব্দুল্লাহ ইবন আকরামকে 'আমীরুল খাযানা' (গভর্নর অব দি স্টেট ব্যাংক) নিযুক্ত করে তাঁর অধীনে কয়েকজন সাহাবীকে কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ করেন। বায়তুলমালগুলোর জন্য যথারীতি 'রেজিস্ট্রার' এবং 'দেওয়ান' প্রণয়ন করা হয়। অবশ্য কোন কোন বায়তুলমালে কি পরিমাণ অর্থ

---

২৩০ ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضع حيث امرت. উদ্ধৃত, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ২৫৬

২৩১ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা* (বয়রুত: দার সাদের, ১৯৫৭), খ. ০৩, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

গচ্ছিত থাকত তা এখন বলা মুশকিল। ঐতিহাসিক ইয়াকূবী এ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা হল, রাজধানীর 'বায়তুলমাল' থেকে শুধুমাত্র রাজধানীর বাসিন্দাদের বেতন, ওযীফা প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হত, তার সর্বমোট পরিমাণ ছিল বছরে তিন কোটি দিরহাম।[২৩২]

বায়তুলমালের উপর খলীফার অধিকার

যদিও বায়তুলমাল খলীফা এবং তার প্রতিনিধিদের হিফাযতে থাকত, কিন্তু বায়তুলমালের অর্থের উপর ব্যক্তিগতভাবে খলীফার অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়তুল মালের আমীর (রক্ষণাবেক্ষণকারী) ছাড়া কিছুই ছিলেন না। "তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের সম্পত্তি আমানত হিসেবেই থাকত।"[২৩৩]

হযরত মালিক ইবন আওস বর্ণনা করেন যে, হযরত 'উমর ফারূক (রা.) তিনটি বিষয়ে শপথ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, বায়তুল মালের সম্পদে কেহ অপরের তুলনায় অধিক হকদার নয়। আমি নিজেও অপর কারও তুলনায় অধিক হকের দাবিদার নই। আল্লাহ্‌র কসম! প্রত্যেক মুসলিমেরই এ সম্পদে নির্দিষ্ট হক বা অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি বেঁচে থাকি তা হলে সান'আ পর্বতের রাখাল নিজ স্থানে পশু চরাবার কাজে ব্যস্ত থেকে এ মাল থেকে তার নিজের অংশ লাভ করতে পারবে।"[২৩৪]

বস্তুত হযরত 'উমর (রা.) পূর্বে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বাণীর ভিত্তিতেই এ কথা বলেছেন এবং তাঁর ন্যায় চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এ অর্থই বোঝতে পেরেছিলেন। তিনিও বলেছেন, "জেনে রাখ, তোমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ধন-মালের (বায়তুলমাল) চাবি আমার নিকট রক্ষিত। আরো জেনে রাখ যে, তা থেকে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে বা বঞ্চিত করে একটি পয়সাও গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই।"[২৩৫]

---

২৩২ আহমাদ ইবনে আবূ ইয়াকুব, *তারীখ আল-ইয়াকূ'বী* (বয়রূত: দারু সাদের, তা.বি), খ. ০২, পৃ. ১৭৫

২৩৩ ড. মুহাম্মাদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু: আবদুল মতীন জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), খ. ২, পৃ. ১৩৮

২৩৪ والله ما احد احق بهذا المال من احد وما انا باحق به من احد ووالله ما من المسلمين احد الا وله فى هذا المال نصيب والله لئن بقيت لكم لا وتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهويو عى مكانه ইমাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (কায়রো: মাতবা'আ আল-শারকিল ইসলামিয়া, ১৮৯৫), খ. ১, পৃ. ৪২

২৩৫ الا ان مفاتيح مالكم معى واعلموا أنه ليس لى أن أخذ منه در هما دونكم ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *মাশকালাতুল ফাকরি ও কাইফা 'আলাজাহাল ইসলামু* (কায়রো: ওয়াহ্‌বা পাবলিসার্স, ২০০৩ ইং), পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমালের আয় এবং কুর'আন কর্তৃক ধার্যকৃত ব্যয়

মালে গনীমতের ব্যয়

জাহেলি যুগের আরবরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে মালে গনীমত পেত, তার সিংহ ভাগের অধিকারী হতেন খোদ গোত্র সরদার এবং বাকিটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত।

বদর যুদ্ধেই মুসলিমগণেরা সর্বপ্রথম মালে গনীমতের অধিকারী হয়। এ সার্বজনীন সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুসলমানদেরকে মৌখিকভাবে কুর'আনের নিম্নোক্ত নির্দেশটি শুনিয়ে দেন।

"হে মুহাম্মদ! লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়।"[২৩৬] অতএব "রাসূলুল্লাহ্ (স.) তা মুসলিমগণের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন।"[২৩৭] "বায়তুল মালের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন পর্যন্ত মালে গনীমতের খুমুস গ্রহণ করা হত না। রাসূল (স.) তাঁর বিবেচনা অনুযায়ীই মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন।[২৩৮] কিন্তু বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন, "তোমরা জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।"[২৩৯]

"স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার ন্যায় মালে গনীমতের বন্টন পদ্ধতিও বলে দেন। তাই বদর যুদ্ধের পর রাসূল (স.) সর্বপ্রথম যে মালে গনীমতকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেন তা হল বনু কায়নুকা'র মালে গনীমত।"[২৪০]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী মালে গনীমতের সিংহভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে বাকি পাঁচ ভাগের এক অংশ বায়তুলমালে জমা করেন।

প্রসঙ্গত দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ্যযোগ্য। আর তা হল:

---

২৩৬ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين আল-কুর'আন, ৮:১

২৩৭ ইবন জারীর, *তাফসীর আত-তাবারী* (বয়রূত: দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৯) খ.০৯, পৃ. ১০৯; আল কাসিম ইবন সালাম আবূ 'উবায়দ, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: ইদারাতু তাহকীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬ ইং), পৃ. ৩১৫

২৩৮ আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* (কায়রো: মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি.), দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ১৩৩

২৩৯ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل আল-কুর'আন, ৮:৪১

২৪০ মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, দ্বাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১. বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই নিঃস্বদের প্রতি কখনো উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। বৃটেন অর্থনৈতিক উন্নতির উচ্চশিখরে পৌছার পরই সরকারি ব্যয় বরাদ্দের সময় গরীব এবং নিঃস্বদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেখানকার বেকাররা ডোল (Dole) নামক একটি আর্থিক সাহায্য পেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানে 'বেভারেজ স্কীম'কে মোটামুটি কার্যকরী করা হচ্ছে এবং বিত্তহীনদের অভাব-অভিযোগ দূর করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু কুর'আন প্রথম অবস্থায়ই বায়তুলমাল থেকে গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্যদান এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। বায়তুলমালে, মালে গনীমতের যে খুমুস দাখিল করা হত তার মধ্যেও একটি নির্দিষ্ট খাত ছিল-যার দ্বারা ইয়াতীম এবং মুসাফিরদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হত। কিন্তু যেহেতু মালে গনীমত কোন স্থায়ী আমদানি (আয়) নয়, তাই স্থায়ী আমদানি (যেমন-সাদাকা) এর মধ্যেও নিঃস্ব এবং বেকারদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল। সাদাকা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

২. প্রাচীণ আরবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেসব নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল রাসূলুল্লাহ (স.) তার বিপরীত নিময়-নীতি প্রচলন করেন। তিনি মালে গনীমতের সিংহ ভাগ অর্থাৎ চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং বায়তুলমালের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাখতেন। এ পঞ্চমাংশ সম্পর্কেও তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'তোমাদের মালে গনীমতের মধ্যে আমার অংশ হল মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং এ অংশও তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।[২৪১]

এভাবে বায়তুল মালের খুমুস আয়ের একটি বিরাট অংশ জনকল্যাণমূলক কাজ অর্থাৎ নিঃস্ব, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হত এবং মোট মালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক অংশের পাঁচ ভাগের এক অংশ আর্থাৎ পচিশভাগের এক ভাগ রাসূলুল্লাহ (স.) এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হত।[২৪২]

"আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহর যুগে খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত-একভাগ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য, একভাগ 'যাভিল কুরবার' (আত্মীয়-স্বজন) জন্য এবং তিনভাগ, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" "হযরত আবূ বকর, 'উমর এবং 'উসমান (রা.) খুমুসকে মোট তিন ভাগে ভাগ করতে। তাঁরা রাসূলের অংশ ও 'যাভিল কুরবা'র অংশ বাতিল করে দন।" অতঃপর হযরত আলী (রা.) হযরত আবূ বকর, 'উমর এবং 'উসমান (রা.) এর বণ্টন পদ্ধতিকেই বহাল রাখেন।[২৪৩]

হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল হানাফিয়া বলেন, রাসূলে কারীমের ওফাতের পর তাঁর এবং 'যাভিল কুরবা'র অংশ নিয়ে মতভেদ শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন, 'রাসূলে কারীমের অংশ তাঁর পর তাঁর খলীফারই

---

২৪১ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (নয়া দিল্লী: ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭), *কিতাবুল জিহাদ*

২৪২ ডবস্তারিত, আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইবন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: ইদারাতু তাহকীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ৩২৫

২৪৩ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ* (বয়রুত: দারুল মা'রেফা, ১৯৭৯), পৃ. ১১; *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া উচিত।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'যাভিল কুরবা'র অংশটি রাসূলুল্লাহর আত্মীয়-স্বজনদের উচিত। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ দু'টি অংশ অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্মের উপর (যুদ্ধ সরঞ্জামাদি) খরচ করা হবে।"[২৪৪]

মালে ফাই-এর ব্যয়

"যে সমস্ত মাল যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই অমুসলিমদের কাছ থেকে লাভ করা হয় তাই হচ্ছে মালে ফাই। চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স.) বনূ নাযীরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে তাদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-কৃষি এবং পরবর্তী সময়ে বণূ কুরায়যার এলাকা, তাদের মাল-আসবাব এবং খায়বারেরও কয়েকটি এলাকা যুদ্ধ ছাড়াই রাসূলুল্লাহর অধিকারে আসে। যেহেতু মালে ফাইয়ের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য মালে গনিমত থেকে আলাদা, তাই রাসূলুল্লাহ (স.) কুর'আনের আয়াতের আলোকে তাকে সরকারি সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন।

"আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফাই দিয়েছেন, তারজন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[২৪৫]

"রাসূলুল্লাহ্ (স.) মালে ফাইকে সরকারি মালিকানাধীণ সম্পত্তি ঘোষণা করে তা নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখেন এবং পরবর্তী সময়ে নিজ অধিকার বলে বনূ নাযীরের কিছু এলাকা মুহাজির এবং নিঃস্ব আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।" "মালে ফাইয়ের ব্যয় সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, বনূ নাযীরের ধন-সম্পদ এমনি ধরনের ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধ ছাড়াই সেগুলো তাঁর রাসূলকে দান করেন। এজন্য মুসলিমগণের উট-ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি (যুদ্ধ করতে হয়নি)। অতএব রাসূল (স.) সেগুলোকে নিজেই গ্রহণ করেন। তিনি এ থেকে সারাবছরের খরচাদি বের করে তার পরিবার-পরিজনকে দিতেন এবং যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া (যুদ্ধের জন্য) এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য খরচ করতেন।"[২৪৬]

মালে গণীমতের শুধু এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে আসত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যয় হত। কিন্তু মালে ফাইয়ের সমস্তটাই বায়তুলমালে জমা করা হত। মালে ফাই-এর খুমুসের (পাঁচ ভাগের এক অংশ ব্যয় সম্পর্কে কুর'আন শরীফে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর বাকি পাঁচ ভাগের চার অংশ রাষ্ট্রনায়কের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মালে গণীমত এবং মালে ফাইয়ের খুমুসের ব্যয়-খাত একই।"[২৪৭]

---

২৪৪ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২৪৫ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
আল-কুর'আন, ৫৯ ঃ ৬

২৪৬ *সহীহ বুখারী*, পারা. ১১, কিতাবুল জিহাদ

২৪৭ মায়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; আবূ ইয়ালা, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

"অতএব খুমুসকে পাঁচটি সমান অংশে বিভক্ত করা হত। এক অংশ রাসূলুল্লাহর জন্য-যা তিনি জীবিত অবস্থায় নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য এবং মুসলিমগণের কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর (স.) ওফাতের পর এ সম্পর্কে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। যারা নবীদের উত্তরাধিকারের পক্ষপাতী তারা বলেন, এ অংশ রাসূলুল্লাহর (স.) উত্তরাধিকারীরাই পাবে। আবূ সওরের মতে এ অংশ ইমামেরই (রাষ্ট্রনায়ক) প্রাপ্য। কেননা রাসূলের ওফাতের পর তিনিই তো তাঁর মূল উত্তরাধিকারী। ইমাম আবূ হানীফার মতে, 'রাসূলের ওফাতের সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকারও বাতিল হয়ে গেছে।' ইমাম শা'ফিয়ীর মতে, 'এ অংশ মুসলমানদের কল্যাণার্থে, যেমন-সৈন্যদের বেতন, সওয়ারী এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, দুর্গ এবং পুল মেরামত, কাজী এবং ইমামদের বেতন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় করা হবে।[২৪৮]

দ্বিতীয় অংশ 'যাভিল কুরবা'দের জন্য। ইমাম আবূ হানীফার মতে, এখন ওদের এ অংশও বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফি'য়ীর মতে বাতিল হয়নি। "যাভিল কুরবা' দ্বারা শুধু আবদে মানাফ, বনূ হাশিম এবং বনূ আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে বোঝায়-অন্যান্য কুরাইশ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে ছোট-বড়, বিত্তহীন-বিত্তশালী সকলে সমান অংশ পাবে, অবশ্য পুরুষলোকেরা পাবে স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ।"[২৪৯]

"তৃতীয় অংশ অভাবগ্রস্ত ইয়াতীমদের জন্য। যে সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের পিতা মারা গেছেন তাদেরকে 'ইয়াতীম' বলা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।"

চতুর্থ অংশ মিসকীনদের জন্য। মিসকীন হচ্ছে মালে ফাইয়ের ঐ সমস্ত অধিকারী যাদের জীবিকার সংস্থান নেই। মালে ফাইয়ের মিসকীন সাদাকার মিসকীন হতে ভিন্ন।[২৫০] সাদাকা মালদার মুসলিমগণের থেকে নিয়ে নিঃস্ব মুসলিমগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু মালে ফাই থেকে মুসলিম, অমুসলিম সকল মিসকীনই সমান ভাবে সাহায্য পায়।

পঞ্চম অংশ ইবনুস্ সাবীলদের জন্য। ইবনুস্ সাবীল বলতে ঐসমস্ত মুসাফিরকে বোঝায় যাদের কাছে পাথেয় নেই। যারা সফরে বের হবে এবং যারা ইতোমধ্যে বের হয়ে গেছে-তারা সকলেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

"বাকি চার-পঞ্চমাংশ মাল বণ্টনের ব্যাপারে দু'টি উক্তি আছে। যেমন : ১. এটা শুধু সেনাবাহিনীর জন্য। এ থেকে সৈন্যদের বেতন দেয়া হবে এবং অন্য কেউ এর অংশিদার হবে না। ২. জনকল্যাণমূলক কাজ, সৈন্যদের বেতন এবং যে কাজ মুসলিমগণের জন্য জরুরী তাতেই ব্যয় করা হবে। মালে ফাইকে সাদাকার অধিকারীদের মধ্যে এবং সাদাকাকে মালে ফাইয়ের অধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়িয হবে না।"[২৫১]

---

২৪৮ মাওয়ারদী, দ্বাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২৪৯ মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২৫০ প্রাগুক্ত

২৫১ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমাল অক্ষমদের সামাজিক নিরাপত্তা

ফকিরদের মত মিসকীনদেরকেও যাকাতের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম বায়যাভীর মতে, মিসকীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে নিঃস্বতা নির্জীব করে দিয়েছে।[২৫২] এভাবে ঐ সব লোকের উপর 'মিসকীন' শব্দ প্রযোজ্য হবে যাদেরকে রোগ অথবা বার্ধক্য এমনভাবে আসার ও নিষ্কর্মা করে দিয়েছে যে, তারা কোন কাজই করতে পারে না এবং পারলেও বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তা দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। যুদ্ধের দরুন যারা অন্ধ, খঞ্জ, খোঁজা অথবা আতুরে পরিণত হয়েছে তারাও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। "ইমাম আবূ হানীফার মতে মিসকীনের অবস্থা ফকিরের চেয়েও খারাপ। কেননা মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে অর্থাভাব একেবারে নির্জীব করে দিয়েছে। তবে উভয়কেই (ফকীর এবং মিসকীন) এ পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তারা নিঃস্ব অবস্থা থেকে সচ্ছলতার প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।"[২৫৩]

ইসলাম একদিকে যেমন জনসাধারণকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেছে অন্যদিকে তেমনি বেকার, বিকলাঙ্গ এবং অক্ষমদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছে।

বায়তুলমাল ও জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার অর্থ এ নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসিয়ে খাওয়াতে থাকবে। বরং লোকেরা সাধ্যানুযায়ী শ্রম করবে, উপার্জন করবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করবে তার পরও যদি কেউ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ থেকে যায় তাহলে তা পরিপূরণে দায়িত্ব হবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থনীতিতে তা হল নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অপূরণীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ কাজ করে না, মনে করতে হবে, সে এ দায়িত্ব পালন করছে না। এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) এর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করা হল, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সমূহ আঞ্জাম দেয়ার কর্তৃত্ব দেবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।"[২৫৪]

---

২৫২ মাওদূদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; আবূ ইয়ালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬; বাবু কিসমাতিস সাদাকাত

২৫৩ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

২৫৪ من ولاه الله عز وجل شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره- *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল 'ইমারা, বাব নং-১৩

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (স.) অন্যত্র বলেছেন, "যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে অভাব পুরণ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্র্যতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজা সমূহ তার জন্য বন্ধ করে দেন।"[২৫৫]

এ হাদীস দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে আল্লাহর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এ কারণে খুলাফায়ে রাশিদীনের পরে হযরত আমীর মুয়াবীয়া'র শাসনামলে এ কাজের প্রতি যখন, উপেক্ষা প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন তাঁকে রাসূলে কারীম (স.) এর এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি অনতিবিলম্বে এ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন।[২৫৬]

সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলতঃ জনগণের সে কল্যাণ-কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ দায়িত্ব পালন করবে না তার পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, "যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা জনগণের শাসক বা পরিচালক বানিয়ে দেবেন, সে যদি তাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না।"[২৫৭]

বায়তুলমাল থেকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা

ইসলাম সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষনা করে, বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। "সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ (হুকুম) বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশও (হুকুম) শেষ দিককার বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসূলের ওফাতের বড়জোর এক বছর পূর্বেকার। তাই নবী যুগে এর জন্য কেন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।"[২৫৮]

---

২৫৫ ما من امام يغلق بابه دون ذوى الحاجة و الخلة و المسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته — সুনানু তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৬

২৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২৫৭ مامن عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة — *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৮

২৫৮ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগে বিত্তশালী সাহাবীরা বিত্তহীন সাহাবীদেরকে ঋণ হিসেবে সুদবিহীন 'করযে হাসানা' প্রদান করেছিলেন। খোদ রাসূলুল্লাহ্ (স.) একবার চল্লিশ হাজারের একটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।[২৫৯]

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়খাতে 'করযে হাসানা' প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট যে, "সরকারি ব্যয়খাতেও 'করযে হাসানা'র জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। হযরত 'উমর (রা.) এবং অন্যান্য খলীফার যুগে এ ধরনের অসংখ্য নযীর পাওয়া যায় যে, লোকেরা নিজেদের বেতনের জামানতে সরকারি 'বায়তুল মাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করত। ইসলামই প্রথম বিশ্বের নিয়মিত 'করযে হাসানা সমিতি' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন সময়ে একজন সচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব সে যখন অন্য একজন সচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে যখন ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন (করযে হাসানার ব্যবস্থা থাকার দরুন) এ সব অভাবগ্রস্তের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোন কারণই থাকল না।"

"খুব সম্ভব দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান এ হতে পারে যে, খোদ রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।"[২৬০]

বায়তুল মালের অর্থে ঋণ পরিশোধ

যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা ঋণগ্রহীতার জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। রাসূলে কারীম (স.) "ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করাকে 'যুলম' আখ্যা দিয়েছেন।"[২৬১] তিনি (স.) ঋণ পরিশোধের মানসিক দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা পরিশোধ করে দেন। আর যে ব্যক্তি (অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে) তা বিনষ্ট করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তা বিনষ্ট করে দেন।"[২৬২] ঋণ পরিশোধের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল তা আমরা সে ঘটনা থেকেই পরিস্কার বোঝেনি যেখানে রাসূল (স.) ঋণ মুক্ত সাহাবীর জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন এবং ঋণগ্রস্ত সাহাবীর জানাযার নামাজ না পড়িয়ে সাহাবীদেরকে পড়িয়ে দিতে বলেছেন।

---

[২৫৯] সুনানু নাসায়ী, কিতাবুল বুয়ু, বাবুল ইসতিকরায

[২৬০] *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[২৬১] *সহীহ বুখারী*, পারা, ০৯, বাবুল হাওয়ালা ও কিতাবুল কিরায

[২৬২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ের মধ্যে বিচারক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ঋণগ্রহীতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন। "যদি তার হাতে মাল আছে বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।"[১৬৩] ফকীহদের মতে, "কোন দেউলিয়াকে কয়েদ করা যুল্মেরই নামান্তর।"[১৬৪]

যদি বিত্তশালী লোক ঋণী অবস্থায় মারা যায় তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকেই তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। আর যদি ঋণগ্রহীতা কপর্দকহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে 'বায়তুল মাল' থেকেই তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর পর তাঁর খলীফারাও এ দায়িত্ব পালন করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও এ নিয়ম ছিল যে, কপর্দকহীন ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সরকারি কোষাগার অর্থাৎ বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করা হয়।

---

[১৬৩] প্রাগুক্ত

[১৬৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উশর

উশরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ এবং প্রচলিত ভাষায়: ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমগণের কল্যাণেই মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদিত শস্যের যে মাশুল আদায় করে তাকেই 'উশর'র বলা হয়। বায়তুলমালের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে 'উশর। যদি কোন গোত্র বা জাতি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের আবাদী জমি, আরবদের জমি, মুজাহিদীন ও গণিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত জমি, পরিত্যক্ত ও কোন মুসলিম কর্তৃক আবাদকৃত জমি এবং উত্তরাধিকারহীণ যিম্মীর মৃত্যুর পর মুসলিমগণের দখলে আসা জমিকেও 'উশরী জমি বলা হয়।[২৬৫]

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যিম্মী প্রজাকে পাট্টার উপর যে সরকারি জামি দেয়া হত তাকে বলা হত খারাজী জমি। এজন্য যিম্মী কৃষককে প্রতি বছর বায়তুলমালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর (খারাজ) জমা দিতে হত। কিন্তু খোদ মুসলিমগণরা আইনগতভাবে যে সমস্ত জমির মালিক ছিল সেগুলোকে বলা হত 'উশরী জমি। ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ('উশর) আদায় করত।

ফকীহ্‌রা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূ-সম্পত্তিকে মোট চার ভাগে ভাগ করেছেন। "(১) যে জমির মালিকানা ইসলাম গ্রহণ করেছে তা 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (২) যে জমি মুসলিমগণরা আবাদ করে তাও 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (৩) যে জমি মুসলিমগণরা তরবারির জোরে দখল করেছে, তাও 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (৪) যে জমির মালিকদের সাথে মুসলিমগণের আপোষ-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা 'ফাই' এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর উপর খারাজ ধার্য করা হয়।"[২৬৬] মোট কথা, 'উশর একটি উৎপাদনশীল কর যা জমির উৎপাদনের উপর ধার্য করা হয়।

কৃষি উৎপাদন থেকে কর আদায় করা সম্পর্কে কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিন তার হক প্রদান করবে।"[২৬৭] "হে মু'মিনগণ তোমরা যা

---

[২৬৫] মাওলানা হিফযুর রহমান, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৭

[২৬৬] মাওয়ারদী, *আল আহকামুস সুলতানিয়া*, চতুর্দশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

[২৬৭] كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده আল-কুর'আন, ৬ : ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"[২৬৮]

হাদীসে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) বলেছেন, "যে জমির সেচ কাজ বৃষ্টি, ঝর্ণা কিংবা নদী থেকে হয়ে থাকে তার ফসলের দশ ভাগের একভাগ ('উশর) হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যে জমিতে (কূপ খনন করে) পানি সেচ করা হয় তার ফসলের বিশ ভাগের একভাগ গ্রহণ করতে হবে।"[২৬৯]

মুফাসসিরগণ শুধু আনাজ-তরকারি বা ফলমূলই নয় বরং খনিজ সম্পদকেও 'আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি'-এর অর্থাৎ জমির উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[২৭০]

খোদ রাসূলুল্লাহ (স.) 'উশর মাশুলের হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। "মু'আয ইবন জাবাল (সরকারি কর্মচারি হিসেবে) যখন ইয়ামানে ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে লিখেন, "যে জমি প্রবাহিত পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে 'উশর (১/১০ অংশ) এবং যে জমি চরকা অথবা বালতির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে নিসফে 'উশর (১/২০ অংশ) ধার্য্য বলে।"[২৭১] বালতি অথবা চরকা দ্বারা সিক্ত জমির উপর নিসফে 'উশর ধার্যকরার যে কারণ ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন তা হল, "এ সমস্ত জমিতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সমস্ত জমি বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় সেগুলোতে অল্প পরিশ্রমেই কাজ চলে।"[২৭২]

মোটকথা; মুসলিমগণের মালিকানাধীন জমির উৎপাদন থেকে আদায়কৃত করকেই 'উশর বলা হয়। কৃষি উৎপাদন দু'রকমের হয়। যথা ঃ (১) ক্ষেতের উৎপাদন ও (২) বাগানের উৎপাদন।

(১) ক্ষেতের উৎপাদন : মুসলিমগণের ক্ষেতের উৎপাদনের উপর যাকাত ওয়াজিব (অবশ্য দেয়)। ইমাম আবূ হানীফা বলেন, 'ক্ষেতের সবরকম শস্যের উপরই যাকাত ওয়াজিব।' কিন্তু ইমাম শাফি'য়ী বলেন, 'শুধু ঐ সমস্ত জিনিসের উপর ওয়াজিব, যে গুলো খাদ্য হিসেবে গুদামজাত করে রাখা হয়। এ কারণে সবজি

---

২৬৮ يأيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض আল-কুর'আন, ২ : ২৬৭

২৬৯ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر *সহীহ্ বুখারী,* কিতাবুয যাকাত, বাব ঃ-৫৫, হাদীস নং-১৪৮৩

২৭০ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল বায়যাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়াল আসরারুত তা'বীল* (মিশর: দার আল-কুতুব আল আরাবিয়া, তা.বি) খ. ০১, পৃ. ১২৪

২৭১ আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: ইদারাতু তাহ্কীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ৪৭৬; বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৭২ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর, *আল-হিদায়া* (করাচী: কালাম কোম্পানী, সন নেই), খ. ১, কিতাবুয যাকাত।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তরকারির উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না'[২৭৩] ইমাম শাফি'য়ীর মতে- 'গম, যব, জোয়ার, ধান, ভুট্টা, বাল্লর (সীম, বরবটি), লুবিয়া, চানা, মসুর, জালিয়া-এ দশ রকমের শস্য থেকে যাকাত আদায় করা হবে।[২৭৪]

ইমাম মালিক এবং আবূ ইউসুফের মতে তরকারি এবং এ ধরণের জিনিস থেকে কোন সাদাকা আদায়করা হবে না। গম, যব, জোয়ার, ডাল, খোরমা, মুনাক্কা, ধান, তিল, মটর এবং ঐ সমস্ত শস্য যেগুলো ওজন করা যায় ও গুদামজাত করে রাখা চলে এবং মসুর, চানা, লুবিয়া, মাম্বকলাই ও কুদার (মটর, যব ও জোয়ায়ের সংমিশ্রণ) এর পরিমাণ যখন পাঁচ 'ওসক্' হয় তখন সেগুলো থেকে সাদাকা আদায় করা হবে এবং এর কম হলে হবে না।[২৭৫]

ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, "আমার মতে শুধু ঐ সমস্ত শস্য থেকেই 'উশর আদায় করা হবে যেগুলো গুদামজাত করে রাখা চলে। শাক-সবজি, ঘাস-পাতা, লাকড়ী এবং যে সমস্ত জিনিস গুদামজাত করে রাখা যায় না (যেমন-তরমুজ, ক্ষীরা, বেগুন, লাউ, গাজর, শাক, ফুল প্রভৃতি) সেগুলো থেকে 'উশর আদায় করা হবে না। আর যে সমস্ত জিনিস গুদামজাত করে রাখা চলে এবং মাপ-ওজনও করা যায় (যেমন-গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, ধান, চাল, তিল, বাদাম, ধনিয়া, জিরা, পেয়াজ, রসুন এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস যখন জমি থেকে পাঁচ 'ওসক্' কিংবা তার চেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়) সেগুলো থেকে 'উশর আদায় করা হবে - যখন জমি নদী অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয়। আর যখন জমি বালতি অথবা চরকা দ্বারা সিক্ত হয় তখন নিসফে 'উশর (১/২০ অংশ) আদায় করা হবে।"[২৭৬]

"ইমাম আবূ হানীফা বলেন, 'উশরী জমিতে যে কোন ফসল -চাই তা তরিতরকারিই হোক কিংবা অন্য কিছু তার উপর 'উশর আদায় করা যাবে। ইমাম যুফারের মতও তাই।"[২৭৭]

"ক্ষেতের ফসল পরিপক্ক হওয়ার পরই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। ফসলকে ঝেড়ে পরিস্কার করার পর যদি এর পরিমাণ পাঁচ ওসক কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তবে যাকাত ওয়াজিব হবে, অন্যথায় হবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে, 'ফসল অল্প হোক, অথবা অধিক হোক, যাকাত ওয়াজিব হবেই।"[২৭৮] কিন্তু বরাবরই এ নিয়ম চলে আসছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ পাঁচ ওসক হলেই তার উপর 'উশর ধার্য্য করা হয়।

---

২৭৩ মাওয়ারদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২৭৪ প্রাগুক্ত

২৭৫ বালাযুরী প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২৭৬ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২৭৭ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন জাবির আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, LUGDUNI BATAVORUM, E.J BRILL. 1968. পৃ. ৫৮

২৭৮ মাওয়ারদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

এবং নিজেদের বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা আশেপাশে লোকেরা যৎসামান্য যে তরিতরকারি লাগায় তার উপর 'উশর ধার্য হয় না। ইমাম আবূ ইউসূফ এবং শাফি'য়ীও এ মত পোষণ করেন যে, পাঁচ ওসকের কম (খাদ্য প্রভৃতি) জিনিসের যাকাত ফরয হয় না।"[২৭৯]

(২) বাগানের উৎপাদন: অন্যান্য যে সব জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তা হচ্ছে খেজুর এবং বিভিন্ন ফল-ফলাদি। ইমাম আবূ হানীফার মতে, "প্রত্যেক রকমের ফল-ফলাদির উপরই যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফি'য়ী শুধু খেজুর এবং আঙ্গুরের উপরই যাকাত ওয়াজিব বলে মনে করেন।"[২৮০] ইমাম শাফি'য়ীর দলীল হচ্ছে এ যে, হযরত 'উমরও শুধু আঙ্গুর এবং খেজুর থেকেই কর আদায় করতেন। তায়িফের কর্মচারি সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ আস্-সাকাফী হযরত 'উমরকে লিখেন, "এখানকার কয়েকটি বাগানের মধ্যে আঙ্গুর, পীচফল এবং আনার ছাড়াও এমন কয়েকটি জিনিস উৎপন্ন হয় যেগুলোর উৎপাদন আঙ্গুরের উৎপাদনের চাইতেও কয়েকগুন বেশী। অতএব আমাকে এ সমস্ত জিনিসের উপর 'উশর ধার্য করার অনুমতি দিন। হযরত 'উমর উত্তরে জানান এ সমস্ত জিনিসের উপর 'উশর ধার্য করা চলে না।"[২৮১] আঙ্গুর এবং খেজুরের উপর এজন্য কর ধার্য করা হয় যে, এগুলো শুকিয়ে গুদামজাত করে রাখা চলে।

মোটকথা, দু'টি শর্তে ফলের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। প্রথম শর্ত এ যে, ফল যেন উপকারী এবং খাদ্যোপযোগী হয়। যদি এর আগেই কেউ (গাছ থেকে ফল) পেড়ে ফেলে তা হলে ওয়াজিব হবে না। কোন আবশ্যক ছাড়াই শুধু যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য এরূপ করা মাকরূহ (দোষণীয়)। দ্বিতীয় শর্ত এ যে, উৎপাদনের পরিমাণ যেন অন্তত পাঁচ ওসক হয়। এর কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য, এক ওসক ষাট সা' এবং এক সা' $৫\frac{১}{৩}$ ইরাকী রতলের সমান। ইমাম আবূ হানীফার মতে, ফলের পরিমাণ অল্প হোক কিংবা অধিক হোক যাকাত ওয়াজিব হবেই। তিনি মোটামুটি হিসেবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফি'য়ীর মতে, মোটামুটি হিসেবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা বৈধ এজন্য যে, এর দ্বারা যাকাতের পরিমাণ এবং তা প্রাপকদের প্রাপ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) এ কাজের জন্য কর্মচারি নিয়োগ করেছিলেন।[২৮২]

---

[২৭৯] *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৫৬ ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة

[২৮০] মাওয়ারদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[২৮১] বালাযুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

[২৮২] মওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলুল্লাহ (স.) খায়বারের খেজুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাকে প্রেরণ করেন।" "রাসূলুল্লাহ (স.) ফল এবং আঙ্গুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণের জন্য লোক (কর্মচারি) প্রেরণ করতেন।"[২৮৩]

আঙ্গুর এবং খেজুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তখনই যখন তা খাদ্যের উপযোগী অর্থাৎ 'বাসার' (বেশ কিছু বড়) এবং এ'নাবে (পরিপক্ক) পরিণত হবে। পরিমাণ নির্ধারণের পর সেগুলোকে 'তামার' (শুষ্ক খেজুর) এবং যাবীবে (মুন্নাকা) রূপান্তরিত করে দেয়া হবে।"[২৮৪]

খেজুর এবং আঙ্গুর যথাক্রমে তামার এবং মুন্নাক্কার পরিণত হয়ে একদম শুষ্ক হওয়ার পর সেগুলো থেকে যাকাত আদায় করা হবে। আর যদি তাজা অবস্থায় গাছ থেকে পাড়া হয় তা হলে বিক্রিত মূল্যের এক-দশমাংশ আদায় করা হবে। "খেজুরের বিভিন্ন জাতকে একই জাত মনে করা হবে। আঙ্গুরের বেলায়ও অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কেননা এগুলোর জাত মূলত একই। কিন্তু খেজুর এবং আঙ্গুরকে একই জাতের অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। কেননা এ দু'টি জিনিস মূলত দু'জাতের।"[২৮৫]

মোটামুটি, পরিমাণ নির্ধারণের পর যাকাত আদায়ের সময় আসার পূর্বেই যদি কোন বিপদ-আপদ অথবা দৈব-দুর্ঘটানায় ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যাকাত মাফ করে দেয়া হবে। আর যাকাত আদায়ের সময় আসার পর যদি নষ্ট হয় তাহলে যাকাত আদায় করা হবে।[২৮৬]

---

২৮৩ তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত

২৮৪ প্রাগুক্ত

২৮৫ প্রাগুক্ত

২৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওয়াক্‌ফ

আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে ওয়াক্‌ফ হল একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রচলন ও প্রসারের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবাগণ কার্যকর নযীর স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। বিত্তবানদের নিত্যদিনের জীবনের চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে। একব্যক্তি নিজের উপার্জিত অথবা অন্য কোন বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিজের জন্য হয়ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে। তা সত্ত্বেও সম্পদের মমতা ও আকর্ষণ অধিকাংশ সময় তাকে অভাবী ও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু যখন তার জীবনের অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর লৌহকঠিন থাবার নিকট পরাজিত হয়ে পড়ে, কেবল তখনই সে অনুতপ্ত হয়ে ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের দৃশ্য সকাল-বিকাল প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও অন্তিম সময় আসার পূর্বে বিত্তবানরা এ ব্যাপারে কল্পনাও করে না। অথচ কত ইয়াতীম, অনাথ ও অন্যান্য গরীব-দুঃখীর করুণ ফরিয়াদ বিত্তবানদের লোভের সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরে বার বার আঘাত করে মৃত্যুবরণ করে। এ জন্য ইসলাম বিত্তবানদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিলতি দূর করা এবং তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রেরণা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, বিত্তবানদের ধন-সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করা ও সামাজিক জীবন উন্নত করার একটি পন্থা হল মানুষ মৃত্যুর লৌহকঠিন অবস্থা সবার আয়ত্বে আসার আগে সুস্থ-স্বজ্ঞান অবস্থায় তার সম্পদের একটি অংশ সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করবে। আর এরূপ দানের নাম হল 'ওয়াক্‌ফ'। অন্য কথায় যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তথা জনসাধারণের জন্য দিয়ে দেয়া হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওয়াক্‌ফ' বলে। একে 'সাদাকায়ে জারিয়া'ও বলা হয়।

বস্তুত হযরত 'উমর (রা.) যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তাই হল ওয়াকফের সঠিক সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোন সম্পত্তি কিংবা কোন বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার নামে ওয়াকফ করা হলে তার আয় ফকীর, গরীব, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তাকে বিক্রি বা হিবা বা ওয়াকফকারীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

"কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?"[২৮৭] এবং "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না।"[২৮৮]

---

[২৮৭] مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا আল-কুর'আন, ৫৭ : ১১

[২৮৮] لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ আল-কুর'আন, ০৩ : ৯২

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) নবী (স.) এর খিদমতে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অমুক বাগানটি যা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করছি।" রাসূল (স.) বললেন, "তুমি এটা তোমার কাওমের অভাবীদের জন্য (ওয়াক্‌ফ) করে দাও।"[১৮৯]

রাসূল (স.) হযরত 'উমরকে উৎপাদিত দ্রব্য ইত্যাদি এবং হযরত তালহা কে বাগান আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করার নির্দেশ দিয়ে কল্যাণমূলক ওয়াকফের জন্য এক শরয়ী ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছেন। এ ভিত্তি প্রত্যেক যুগের মুসলিম সমাজে এক প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া তা মুসলিমদের অন্তরে নেক কাজ করার আবেগ জাগ্রত করার এক আলোকময় উদাহরণ ও দলীল হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। আর সে কারণেই মুসলিম সমাজে প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যার জন্য সমাজের বিত্তশালীরা নিজেদের সম্পদের একটি অংশ ওয়াকফ করেননি।

এ ধরনের ওয়াক্‌ফ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী ব্যবস্থার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এর অর্থ দিয়ে ফকীর এবং অক্ষমদের জন্য আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ আশ্রয়স্থল থেকে তারা তাদের ক্ষুধা ও লজ্জা নিবারণ করতে পারত। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফকীর, মিসকীন ও অভাবীদেরকে এ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হত। এ ছাড়া তাদের জন্য সফর ইত্যাদির সুযোগ করে দেয়া হত।

মুসলিমগণরা তালাশ করে বেড়াত যে, কোন সমাজের এমন কোন প্রয়োজন আছে কি না যা পূরণ করা যায়? অতঃপর তারা এজন্য নিজের সম্পদের কিছু অংশ ওয়াকফ করে দিতেন। এমনকি তারা অসুস্থ পশুর চিকিৎসা, মালিকহীন কুকুরের খাদ্য প্রভৃতির জন্য আওকাফ (ওয়াকফের বহুবচন) কায়েম করতেন। নির্বাক পশুদের জন্য যদি মুসলিমগণের মনে এত দয়া থেকে থাকে তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জন্য তাদের মনের অবস্থা কি রকম ছিল তা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম সমাজে ইয়াতীম, অসহায়, অন্ধ, বেকার, সবধরনের অক্ষম ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আক্রান্ত অভাবীদের জন্য যদি ওয়াকফের এক ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাতে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা এখানে মিসরের মামলুক যুগের এক ঐতিহাসিক ঘটনা পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করি। এ ঘটনাটি হল, 'কালাউন হাসপাতাল ওয়াকফের দলীল'। ওয়াকফনামাটি একটি সরকারি দলীল। এ দলীলে ওয়াকফকারী নিজের ওয়াকফ সম্পর্কে প্রত্যেক জিনিস লিপিবদ্ধ এবং তার সীমা নির্ধারণ করেন। মুসলিমগণের মধ্যে থেকে কয়েকজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তার সাক্ষী করেন। যাতে যার তত্ত্বাবধানে

---

[১৮৯] *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকফ সম্পত্তি চলবে সে তার পূর্ণ ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে পারেন। ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ককে 'নাযির' নামে অভিহিত করা হয়। উল্লিখিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওয়াকফনামায় বলা হয়েছে,

"এ চিকিৎসালয় মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের চিকিৎসার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। সচ্ছল অথবা বিত্তশালী, ফকীর অথবা অভাবগ্রস্ত, কায়রো অথবা তার উপকণ্ঠের বাসিন্দা অথবা বাহির থেকে আগত নারী-পুরুষ এবং ভিন্ন ধরনের রোগ নির্বিশেষে সবাই একসাথে অথবা পৃথকভাবে বার্ধক্য ও যৌবনকালে এ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে। নারী-পুরুষ, ফকীর ও অভাবগ্রস্ত রোগীরা নিজেদের পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসা এবং চিকিৎসার জন্য এ হাসপাতালে অবস্থান করবে। হাসপাতালে চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য যা কিছু সরবরাহ করা হবে তা স্থানীয় ও মুসাফির সবার জন্য শর্তহীনভাবে ব্যয় করা হবে এবং নাযির এ ওয়াকফের আয় থেকে রোগীদের প্রত্যেক প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। যেমন, বিছানা লেপ ও তোষক ইত্যাদি। প্রত্যেক রোগীর জন্য তার রোগ এবং অবস্থা অনুযায়ী চারপায়া এবং বিছানা সরবরাহ করবেন। এ সকল রোগীর অধিকার আদায়ে খোদাভীতি ও তার আনুগত্যকে সামনে রাখতে হবে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের প্রজা মনে করে তাদের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা প্রত্যেক শাসককে নিজের প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গোশত এবং সামান্য দ্রব্য রান্নার ব্যবস্থা হাসপাতালের বাবুর্চি করবেন। প্রত্যেক রোগীর জন্য যা রান্না করা হবে তা তার জন্য এক বিশেষ কক্ষে ঢেকে রাখা হবে। অন্য রোগী তা থেকে কিছু নিতে পারবে না। যখন সকল রোগীর জন্য খানা তৈরী হবে তখন প্রত্যেক রোগীকে তার নিজের খাবার দেয়া হবে।" ঐতিহাসিক দলীল সে যুগের যে যুগকে মুসলিম ও ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগের মোকাবেলায় নিম্নমানের হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে।[২৯০]

---

[২৯০] ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত* (বয়রূত: আর-রিসালাহ পাবলিশার্স, ২০০০), পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থা

সাদাকাতুল ফিতর

রমযান মাস শেষ হওয়ার পর 'ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন প্রত্যেক ধনী মুসলিম গরীবদেরকে যে খাদ্য বা অর্থ প্রদান করে তাকে 'সাদাকাতুল ফিতর' বলা হয়। মুহাদ্দিসরা তাকে 'যাকাতুল ফিতর'ও বলে থাকেন। হাদীস ও অন্যান্য প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরয হওয়ার আগেই 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করার আদেশ জারি করেছিলেন।[২৯১] এ সাদাকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। ফিতরা রমযান পূর্ণ করার পর এবং 'ঈদুল ফিতরের পূর্বে আদায় করতে হয়। ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পেছনে দু'টি হিকমত রয়েছে:

(১) রমযান মাসে রোযাদার কর্তৃক সংঘটিত ছোট-খাট পাপ এর দ্বারা মাফ হয় অর্থাৎ ফিতরা হল গুনাহের ক্ষতিপূরণ।

(২) ফকীর-মিসকীনকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা যে, মুসলিম সমাজ তাদেরকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যায়নি বরং তাদের কথা খেয়াল রেখেছে, ঈদের দিনে তাদেরকে ভাই-বোন বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের আনন্দে তাদেরকে শরীক করেছে।

"হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ফিতরার যাকাত এজন্য ফরয করেছেন যাতে রোযাদারগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হয় এবং ফকীর-মিসকীনরা খাদ্য লাভ করতে পারে।"[২৯২]

রাসূল (স.) ফিতরার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন এবং পরাধীন, নর-নারী, ছোট-বড় মুসলিমের উপর ফরয করে দিয়েছেন এবং ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৯৩] খেজুর এবং যব ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যও ফিতরা হিসেবে দেয়া চলে।

---

[২৯১] আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলূক* (ব্রিল: ১৯৬৪), পৃ. ১২৮১

[২৯২] قال ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والر فث وطعمة للمساكين আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস সাজিসতানী, *সুনানু আবী দাউদ* (ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), কিতাবুয যাকাত, বাব নং-১৮; ইবন মাজা, কিতাবুয যাকাত বাব নং-২১

[২৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

"আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 'আমরা সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা'খাদ্য অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনীর অথবা এক সা' যাবীব (শুষ্ক আঙ্গুর) দিতাম।"[২৯৪]

'ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স.) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তাঁর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে দিতেন। এর ফলে ফকী-মিসকীনরা ঘরে সাওয়াল করতে গিয়ে নামায থেকে গাফিল (অন্যমনস্ক) হয়ে পড়ে না বরং আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।[২৯৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে সাহাবায়ি কিরাম সাদাকাতুল ফিতরকেও একটি সুশৃংখল দানে রূপ প্রদান করেন। অধিকাংশ সাহাবা ঈদের দু'একদিন পূর্বেই তাঁদের সাদাকাতুল ফিতর বায়তুলমালে পাঠিয়ে দিতেন। "আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা.) ঈদুল ফিতরের দু'তিন দিন পূর্বেই যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারির কাছে তার নিজের সাদাকাতুল ফিতর পাঠিয়ে দিতেন।"[২৯৬] ইমাম বুখারী লিখেছেন, "লোকেরা তাদের সাদাকা সরাসরি ফকীর-মিসকীনকে না দিয়ে ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিকে দিয়ে দিত, যাতে সব মাল একত্রিত হয়ে পরবর্তী সময়ে ইমাম কর্তৃক গরীবদের মাঝে সুচারুরূপে বণ্টিত হয়।"[২৯৭] "স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাদাকাতুল ফিতর একত্র করার জন্য আবূ হুরায়রা (রা.) কে কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।"[২৯৮]

ফিতরার ব্যয়খাত

"এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত যে, সাদাকাতুল ফিতর অভাবগ্রস্ত মুসলিমগণের মাঝে বণ্টন করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তাদেরকে ঐদিন (ঈদের দিন) সওয়ালের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দাও।"[২৯৯]

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

২৯৪ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (নয়া দিল্লী: ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭) কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৭০, হাদীস নং-১৫০৩

২৯৫

عن ابى سعيد الخدرى يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر صاعا من اقط أو صاعا من زبيب

সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৭৩, হাদীস নং ১৫০৬

২৯৬ শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর, *আল-হিদায়া* (করাচী: কালাম কোম্পানী, তা.বি), খ. ১, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সাদাকাতিল ফিতর

২৯৭

كان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৭৫, হাদীস নং-১৫১১

২৯৭ *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাবু সাদাকাতিল ফিতর

২৯৮ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক* (বৈরূত: ১৯৬৪), পৃ. ১২৮১

২৯৯ ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

যিম্মী ফকীরদেরকে ফিতরা দেয়া জায়িয কি না? এ সম্পর্কে ফকীহরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। জমহুর ফুকাহার মতে জায়িয নয়; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে জায়িয। জমহুর ফুকাহার মতে, দারিদ্র্য এবং ইসলাম এ দু'শর্তেই গরীবদেরকে সাদাকাতুল ফিতর দেয়া হয়। অতএব যিম্মীরা তা পেতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে দারিদ্রতার কারণে সাদাকাতুল ফিতর দেয়া হয়। অতএব যিম্মী গরীবরাও সাদাকা পাওয়ার যোগ্য।"[৩০০]

খারাজ

বিজিত দেশের যেসব খলীফা বিজিত দেশের কৃষি জমিকে তাদের অধিকারেই থাকতে দিয়েছেন, যেসব অমুসলিমগণের সাথে আপোস ও সন্ধি হয়েছে এবং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও আশ্রয় লাভ করে যিম্মিত্ব গ্রহণ করেছে তাদের জমি-জমাকে খারাজী জমি বলা হয় আর খলীফা এসব জমির উপর যে কর ধার্য করেন তাকে বলা হয় খারাজ।[৩০১]

খারাজের অর্থ হচ্ছে, ভূমি ব্যবহার করার সে সরকারি বিনিময়, যা ইসলামী রাষ্ট্র তার যিম্মী প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে। ভূমি জরিপ এবং ভূমির উৎপাদনকে যাচাই করার পর সরকার নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। ইসলাম পূর্ব যুগে মিসর, সিরিয়া, ইরাক এবং ইরানের প্রজাসাধারণের কাছ থেকে খারাজ এবং জিযিয়া এ দু'ধরণের করই আদায় করা হত। রোমীয় এবং ইরানী উভয় সাম্রাজ্যেই এ কর প্রচলিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (স.) যুগে যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বণ্টন করা হত না সেগুলো সরকারি ভূ-সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত। ঐ সম্পত্তিগুলো খোদ রাসূলুল্লাহ (স.) ব্যবস্থাধীন থাকত। রাসূল (স.) সেগুলোর উৎপাদন থেকে নিজের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকত তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

অতঃপর হযরত 'উমরের খিলাফতকালে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হলে তিনি বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সাহাবা কিরামের (রা.) সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, "বিজিত ভূ-সম্পত্তিগুলো সাবেক মালিকদের হাতেই রাখা হবে এবং তাদেরকে এগুলো থেকে বেদখল করা হবে না। এ ভূ-সম্পত্তির খাজনা থেকে শুধু বিজয়ীরাই নয় বরং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলমানই উপকৃত হতে থাকবে।[৩০২] হযরত 'উমর (রা.) ছিলেন সে জাতীয় ব্যবস্থাপক, যাদের সম্পর্কে প্রফেসর ডাল্টন বলেছেন, "প্রকৃত

---

৩০০ আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবী *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বয়কত: দারুল মা'রিফা, ১৯৮১), খ. ১, পৃ. ২৫৬

৩০১ মাওলানা হিফযুর রহমান, অনুঃমাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৮

৩০২ আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ* (বয়কত: দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপক শুধু বর্তমানের নয় বরং ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করেন। মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়, কিন্তু মানুষ যে মিল্লাতের একটি বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের জন্য বর্তমানের একটি ক্ষুদ্র স্বার্থকে তিনি বলি দিতে প্রস্তুত থাকেন।"[৩০৩]

মোট কথা হযরত 'উমর (রা.) বিজিত ভূ-সম্পত্তি বন্টন না করে জনস্বার্থের খাতিরেই সাবেক কৃষকদের দখলে তা রেখে দেন এবং কৃষকরা নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে থাকে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় উপরিউক্ত ভূ-সম্পত্তিকে 'খারাজি আরদিয়াত' বলা হত। 'খারাজি আরদিয়াতে'র মালিক ছিল বায়তুলমাল অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম সমাজ।

হযরত 'উমর (রা.) ইরাকের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি জারীবে এক কা'ফীয এবং এক দিরহাম ভূমিকর নির্ধারণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে কিসরা ইবন কুবাযের (শাহ ইরান) অভিমতই গ্রহণ করেছিলেন।"[৩০৪]

এভাবে হযরত 'উমর (রা.) আবশ্যকীয় সংস্কার সাধনের পর মিসরে বহু যুগ থেকে প্রচলিত ফেরা'উনী এবং রোম দেশের ভূমিকর ব্যবস্থা বহাল রাখেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত 'উমর (রা.) কৃষকদেরই জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে নিজ নিজ অধিকৃত জমি থেকে বেদখল করাকে তিনি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩০৫]

জিযিয়া

পূর্বতন ঐশী গ্রন্থধারী, অনারব মুশরিকরা যদি পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি জানায় এবং নিজেদের জান-মাল ও মান-ইযযত রক্ষার শর্তে বার্ষিক কিছু কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নেয় এরূপ করকে 'জিযিয়া' বলা হয়। জিযিয়ার বিধান প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।"[৩০৬]

---

৩০৩ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩০৪ আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া* (কায়রো: মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ১৪১

৩০৫ আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৩০৬ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون আল-কুর'আন, ৯ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ফাই

মুসলিম বাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যদি অমুসলিমরা নিজেদের ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় তাদের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদকে 'ফাই বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে ফাইয়ের সম্পদ বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব সম্পদ গণীমতের মাল লাভকারী ও মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা যাবে না। কেননা এ সব বিনা যুদ্ধেই লাভ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩০৭]

খুমূস

গণীমতের সম্পদ বন্টনের আগে এবং রিকায (মাটির নিচে প্রোথিত ও খনি থেকে আহরিত সোনা-রূপা ইত্যাদি) থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বে সে সবের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে। এটা রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রাপ্য। এ এক-পঞ্চমাংশকেই 'খুমূস' বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে গণীমতের সম্পদের উল্লেখ প্রসঙ্গে বায়তুলমালের প্রাপ্য এ এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি বান্দার উপর নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[৩০৮]

বিশুদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রিকায বা প্রোথিত বস্তুতেও খুমূসের বিধান রয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "রিকাযের মধ্যে খুমূস' ওয়াজিব।"[৩০৯]

আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থে রিকায বলা হয় প্রোথিত বস্তুকে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নবী (স.) থেকে বর্ণিত একটি উদ্ধৃতিতে 'রিকাযে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছেন, নবী (স.) নিকট জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'রিকায' কি বস্তু? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব সোনা-রূপা সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ খনি)।"[৩১০]

---

৩০৭ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
আল- কুর'আন, ৫৯ : ৬

৩০৮ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
আল-কুর'আন, ৮ : ৪১

৩০৯ وفى الر كاز الخمس *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৬৬, হাদীস নং-১৪৯৯

৩১০ কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আশুর

ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বিধান ছিল, যদি কোন মুসলিম ব্যবসায়ী ব্যবসার পণ্য নিয়ে তাদের দেশে যেত, তারা তাদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে কাস্টমস বা শুল্ক আদায় করত। বছরে যতবার তারা যাতায়াত করত ততবারই তাদেরকে এ শুল্ক প্রদান করতে হত। অপরদিকে অমুসলিম বণিকেরা ইসলামী রাষ্ট্রে এলে এ ধরনের শুল্ক দিতে হত না। তাতে করে মুসলিম বণিকদের লোকসান দিতে হত কিন্তু অমুসলিম বণিকেরা লাভবান হত। একবার এ ব্যাপারটির প্রতি দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমরের (র.) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার পর তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরদের এ মর্মে পত্র লিখেন, তোমরাও বাণিজ্যিক পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করবে। শুধু অমুসলিম বণিকদের নিকট থেকেই নয়, বরং মুসলিম ও যিম্মীদের মধ্যেও যারা 'দারুল হারব' এবং দারুল ইসলামে আন্তঃরাষ্ট্রিক বাণিজ্য করবে, তাদের সবার নিকট থেকেই শুল্ক আদায় করতে হবে। তবে একবার যে ব্যবসায়ীর নিকট থেকে শুল্ক আদায় করা হবে, সারা বছর সে যতবারই যাতায়াত করুক না কেন, দ্বিতীয়বার আর নেয়া যাবে না। অবশ্য মুসলিম, যিম্মী ও অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির বণিকের নিকট থেকে শুল্ক আদায়ের বেলায় কিছুটা পরিমাণগত পার্থক্য থাকবে। তবে শুল্ক দু'শ দিরহাম কিংবা বিশ মিসকাল (বিশ মিসকাল মুদ্রাকারে সাড়ে সাত তোলা সোনার সমান) মূল্যের পণ্য হলে দিতে হবে। এর চেয়ে কম হলে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে আদায়কৃত শুল্ককে 'আশুর' বলা হয়। এ শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হল, মুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, যিম্মীদের বিশ ভাগের এক ভাগ, হারবী বা বিধর্মী রাষ্ট্রের অমুসলিম বণিকদের ব্যবসা পণ্যের দশ ভাগের এক ভাগ।[৩১১]

ভূমি রাজস্ব

ইমাম কিংবা খলীফা যেসব সরকারি জমি বার্ষিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে চাষাবাদ করার জন্য প্রদান করেন, সেসব থেকে আদায়কৃত কর বা রাজস্বকে বলা হয় 'কিরাউল আরদ্'। যে সব সরকারি জমি থেকে 'উশর কিংবা খারাজ আদায় করা হয় না, বরং ভাড়ার বিনিময়ে চাষাবাদ করার জন্য দেয়া হয়, ইসলামী পরিভাষায় এ ধরনের জমিকে 'আরদুল মুনলিকা' (খাস জমি) কিংবা 'আরদুল হাউজাহ্' (দখলীকৃত জমি) বলা হয়। সাধারণত দু'ধরনের জমি করাউল আরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। **এক.** উত্তরাধিকারী না থাকার দরুন যেসব জমি বায়তুলমালে জমা হয়ে যায়, **দুই.** সামরিক অভিযানে বিজয় লাভের পর যে সব জমি সাধারণ মুসলিমগণের জন্য ওয়াকফ হিসেবে পরিগণিত হয়ে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে কৃষকদের চাষাবাদের জন্য দেয়া হয়। 'উশর ও খারাজ সম্পর্কিত কুর'আনের যেসব আয়াত ও যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, 'কিরাউল আরদে'র বিধানও সেসব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

---

[৩১১] কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩-৫২৪

Dhaka University Institutional Repository

লা-ওয়ারিস মাল

লা-ওয়ারিস মালও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি উৎস। যেহেতু রাষ্ট্রকে দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করা হয়, তাই আইনসম্মতভাবেই মৃত ব্যক্তির লা-ওয়ারিস মাল জাতীয় সম্পদের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ইসলামী আইনও রাষ্ট্রের এ অধিকারকে সমর্থন করেছে। অতএব বায়তুলমালই হবে লা-ওয়ারিস মালের নিরংকুশ অধিকারী।

কোন মুসলিম কিংবা যিম্মী যদি মৃত্যু হয় এবং তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। অনুরূপ যদি কোন যিম্মী বিদ্রোহী হয়ে কিংবা আল্লাহ না করুন, কোন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারব বা বিধর্মী রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তবে তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং বায়তুলমালের মালিকানায় চলে যাবে।[৩১২]

মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবন আল-'আস খলীফা হযরত 'উমর (রা.) কে মিসরের ঐ সমস্ত রাহিব (পুরোহিত) যারা লা-ওয়ারিস অবস্থায় মারা যায় তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, "যদি এদের কোন ওয়ারিস থাকে তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসদের হাতেই সমর্পণ কর, আর যদি ওয়ারিস না থাকে তাহলে তা বায়তুলমালে দাখিল করে নাও।"[৩১৩]

লা-ওয়ারিস মালের উপর চাই তা স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা বলেন 'যার কোন উত্তরাধিকারী নেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার পক্ষ থেকেই সাদাকা হিসেবে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে খরচ করা উচিত।' ইমাম শাফেয়ী বলেন, "লা-ওয়ারিস সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণার্থেই ব্যয় করা হবে। কেননা প্রথমে এর মালিক ব্যক্তি বিশেষ হলেও বায়তুলমালে দাখিল করার পর তা সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।"[৩১৪] লা-ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তি নিহত হলে তার রক্তমূল্যও বায়তুলমালে দাখিল করা হবে।

সারাইব

দুরাবস্থা, দুর্ভিক্ষাবস্থা, জনকল্যাণ এবং জনগণের বেকারত্ব দূর করার জন্য যাকাত, সাদাকাত ছাড়াও যে কর (আর্থিক সাহায্য) সরকারের তরফ থেকে বিত্তবানদের উপর আরোপ করা হয় তাকে 'দারাইব' বলে। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কর বলতে যা বোঝানো হয় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে জনগণের উপর যে সব কর ধার্য করা হয়, সাধারণত এগুলো ইনসাফ বা ন্যায়ভিত্তিক নয়; রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র পরিচালকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমানে এসব কর ধার্য করা হয়। এ সবের সাথে জনস্বার্থের সম্পর্ক খুব একটা নেই বললেই চলে।

---

৩১২ আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কা'সানী, *বাদায়েউস্ সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে* (মিসর: মাতবা'আতুল জামালিয়া, ১৯১০), খ. ৭, কিতাবুস সিয়ার, পৃ. ১৩৬

৩১৩ আলাউদ্দীন আলী আল মুত্তাকী ইবন হিসামুদ্দীন আল হিন্দী, *কানযুল উম্মাল* (বয়রূত: মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯), পৃ. ১৫২

৩১৪ মাওবর্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, সপ্তদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

যাকাত

যাকাত বণ্টনে ইসলাম যে দার্শনিকসুলভ ও ইনসাফ ভিত্তিক নীতি গ্রহণ করেছে তা বর্তমান যুগের (যে যুগে পেশকৃত জীবন ব্যবস্থাসমূহ ও আইন প্রণয়নকে কিছু মানুষ আধুনিক বরং অত্যাধুনিক বলে মনে করে। সমগ্র উন্নত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মুকাবিলায় পেশ করা যায়। একথা সবারই জানা যে, জাহেলী ও অন্ধকার যুগে ইউরোপে কৃষক, শিল্পপতি, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে কিভাবে কর আদায় করা হত। তারা সবাই নিজের হাতে পরিশ্রম করে গায়ের ঘাম পায়ে ফেলে, বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে এবং দিনভর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে নিজের রুজী কামাই করত। মজুরের কষ্টের সম্পদ কিভাবে শাহানশাহ, বাদশাহ, আমীর অথবা সুলতানের আলীশান রাজধানীতে পৌছাতো। আর তারা এ সম্পদ নিজের সিংহাসন ও ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ, নিজের শান শওকতের প্রদর্শন, নিজের চাটুকার ও অনুসারীদের পিছনে খরচ করত। নিজের প্রয়োজনের কিছু অতিরিক্ত সম্পদ যদি থাকত তাহলে তা শহরের বিস্তৃতি এবং আরাম আয়েশ ও শহরবাসীর মনোতুষ্টির জন্য ব্যয় করা হত এর পরেও যদি কিছু সম্পদ বেঁচে যেত তাহলে তা সেসব শহরের জন্য বরাদ্দ করা হত, যেসব শহর শাহানশাহ অথবা সুলতানের দরবারের কাছের হত। কিন্তু দূরদূরান্তের শ্রমজিবি মানুষের কাছ থেকে আদায়কৃত কর লব্ধ সম্পদের কিছুই তাদের জন্য ব্যয় করা হত না।

ইসলামের আগমনের পর মুসলিমগণকে যখন যাকাত আদায়ের হুকুম দেয়া হল তখন মুসলিম শাসকদেরকেও এ হুকুম দেয়া হল যে, বিত্তবান এবং তাদের সম্পদের পবিত্রকরনের জন্য তাদের কাছ থেকে যাকাত নিতে হবে ও সমাজের অভাবী ও ফকীর শ্রেণীকে দারিদ্রের অভিশাপ এবং অভাবের নীচতা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং ন্যায় ও ইনসাপের যুগের প্রবর্তন হবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যাকাতের নির্দেশ দেয়া হল তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) যাকাতের কর্মচারিদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণের সময় এ নির্দেশ দিলেন যে, সেসব এলাকার বিত্তবানদের যাকাত গ্রহণ করে সেসব এলাকারই ফকীর এবং মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন কর। আগে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত মু'আয ইবন জাবালের (রা.) হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম (স.) তাকে ইয়ামানের দিকে প্রেরন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, সে সব এলাকার বিত্তবানদের যাকাত গ্রহণ করে সেসব এলাকারই ফকীর এবং মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন কর। হযরত মু'আয (রা.) আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) এর নির্দেশ মুতাবিক আমল করেছিলেন এবং ইয়ামানবাসীর যাকাত সেখানকার হকদারদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। বরং প্রত্যেক

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের যাকাত সেখানকার অভাবী এবং মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। যারা নিজের বংশীয় এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে তিনি লিখিত পয়গামও প্রেরণ করেছিলেন। এ পয়গামে বলা হয়েছিল যে, যাকাত ও 'উশর তাদের (যাদের থেকে নেয়া হয়েছে) বংশীয় এলাকাতেই ব্যয় করা হবে।[৩১৩]

যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা

'সামাজিক নিরাপত্তা' এখন যাকাত অপেক্ষাও অধিক ব্যাপক ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা। কেননা সমগ্র জীবনের শাখা প্রশাখাসমূহে তা বাস্তবভাবে কার্যকর হয়ে চলছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্ত দিকই তার অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্ত শাখা বা প্রশাখার একটা অংশ হচ্ছে যাকাত। আর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এখানকার সামাজিক বিমা ও সামাজিক নিরাপত্তা দুটিই। 'সামাজিক বিমা' ও 'সামাজিক নিরাপত্তা' এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিমার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের আয় থেকে কিস্তি দিতে হবে। আর সামাজিক বা স্থায়ী অক্ষমতা দেখা দিলে তখন সে তা থেকে উপকৃত হবে। কিন্তু 'নিরাপত্তা' ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই তার রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সমাজের ব্যক্তিদের সেজন্য নির্দিষ্ট হারে কোন কিস্তি দিয়ে তাতে শরীক হতে হবে না।

মূলত ইসলাম যে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তণ করেছে তা যদি বংলাদেশে বাস্তবায়িত হত এবং সরকার যদি সে অনুযায়ি যাকাত আদায় এবং বণ্টন করার ব্যবস্থা করে তাহলে বাংলাদেশে কোন গরিব খুঁজে পাওয়া যাবেনা। বাংলাদেশে দুনিয়াবি যে আইন চালু রয়েছে তাতে যাকাত আদায় এবং বণ্টন করার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতি বছর বাংলাদেশের সম্পদশালীদের যত টাকার যাকাত ফরয হয় তা আদায় করে সরকারী কোষাগারে গচ্ছিত রেখে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের মাধ্যমে ভাবে অভাবগ্রস্তদের মাছে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দেখা যাবে এদেশে একটি গরীব লোকও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

প্রতি বছর বাংলাদেশে জাতীয় যাকাত ফাণ্ডে যাকাতের টাকা জমা রাখা হয় এবং তা সরকারি ভাবে ব্যয় করা হয়। অবশ্য সরকারি ভাবে এর পরিমাণ খুবই সিমিত এবং সুফলও গরিব মানুষ খুব বেশি একটা ভোগ করতে পারেনা।

বিচ্ছিন্ন ভাবে যে পরিমাণ যাকাত প্রতি বছর এ দেশের ধণীরা গরিবদের মাঝে বিতরণ করে তাতে গরিব'রা সাময়িকভাবে উপকৃত হলেও দীর্ঘ মেয়াদী কোন ফল বয়ে আনেনা। গরিব গরিবই রয়ে যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আজ যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করা যেমন সহজ, আবার তেমনি দূরূহ। কারণ এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারাই আসে তারা প্রায় সবাই মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতি না থাকায় তারা এ ব্যবস্থা

---

[৩১৩] নববী, নাইলুল আওতার, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন করছেন না। অথচ তারা যদি একটু চেষ্টা করে তাহলে এদেশের গরিব শ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসত।

অপরদিকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকার ফলে বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন রাষ্ট্রীয় ভাবে করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেন সুদের মাধ্যমে, তাই তারা যে পরিমান টাকা সুদ পরিশোধ করেন তাতে তাদের যাকাত দানে আগ্রহ থাকেনা। যারা যাকাত দেয় তারা বিচ্ছিন্ন ভাবেই যাকাতের হক আদায় করেন।

অবশ্য কিছু কিছু লোক আছেন যারা নিজ উদ্যোগে পুরোপুরিই যাকাতের হক আদায় করেন। আবার অনেকে দায় সারা ভাবে যাকাত প্রদান করেন। অথচ বাংলাদেশের ধণী সম্প্রদায় যদি ইসলামী হুকুম অনুযায়ী যাকাত আদায় করতো তাহলে এদেশের মানুষ কত সুখে-শান্তিতে থাকতো।

বায়তুলমাল

ফকীর শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত শ্রমিককেও বোঝায় যারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অসহায় অবস্থায় এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করে। কুর'আনের এক জায়গায় 'ফুকারা' শব্দ ঐ সমস্ত মুহাজিরের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে যারা কুরাইশদের যুলুম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিল এবং এখানে পৌঁছার পর জীবিকার সন্ধান করেছিল। যেমন কুর'আনে বলা হয়েছে, "(বিশেষত উপরিউক্ত মাল) প্রাপ্য হচ্ছে দরিদ্র মুহাজিরদের যারা নিজেদের আবাসভূমি এবং বিষয় সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে (এবং) তারা আল্লাহর রহমত ও সন্তোষ লাভের কামনা করে।"[৩১৬]

ফকীরদের মত মিসকীনদেরকেও যাকাতের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম বায়যাভীর মতে, মিসকীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে নিঃস্বতা নির্জীব করে দিয়েছে।[৩১৭] এভাবে ঐ সব লোকের উপর 'মিসকীন' শব্দ প্রযোজ্য হবে যাদেরকে রোগ অথবা বার্ধক্য এমনভাবে আসার ও নিষ্কর্মা করে দিয়েছে যে, তারা কোন কাজই করতে পারে না এবং পারলেও বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তা দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। যুদ্ধের দরুন যারা অন্ধ, খঞ্জ, খোঁজা অথবা আতুরে পরিণত হয়েছে তারাও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। "ইমাম আবূ হানীফার মতে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের চেয়েও খারাপ। কেননা মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে অর্থাভাব একেবারে নির্জীব করে দিয়েছে। তবে উভয়কেই (ফকীর এবং মিসকীন) এ পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তারা নিঃস্ব অবস্থা থেকে সচ্ছলতার প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।"[৩১৮]

---

৩১৬ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا আল-কুর'আন, ৫৯ : ৮

৩১৭ মাওরদী, একাদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; আবূ ইয়ালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬; বাবু কিসমাতিস সাদাকাত

৩১৮ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একদিকে যেমন জনসাধারণকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেছে অন্যদিকে তেমনি বেকার, বিকলাঙ্গ এবং অক্ষমদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছে।

বায়তুলমালে সামাজিক নিরাপত্তা

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সিমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার অর্থ এ নয় যে, বায়তুলমাল লোকদেরকে বেকার বসিয়ে খাওয়াতে থাকবে। বরং লোকেরা সাধ্যানুযায়ী শ্রম করবে, উপার্জন করবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরন করবে তার পরও যদি কেউ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরনে অসমর্থ থেকে যায় তাহলে তা পরিপূরনে দায়িত্ব হবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থনীতিতে তা হল নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অপূরণীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ কাজ করে না, মনে করতে হবে, সে এ দায়িত্ব পালন করছে না। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করা হল,

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমগণদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সমূহ আঞ্জাম দেয়ার কর্তৃত্ব দেবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।"[৩১৯]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) অন্যত্র বলেছেন, "যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে অভাব পুরণ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্র্যতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজা সমূহ তার জন্য বন্ধ করে দেন।"[৩২০]

এ হাদীস দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে আল্লাহ্র তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এ কারণে খুলাফায়ে রাশিদীনের পরে হযরত আমীর মুয়াবীয়ার শাসনামলে এ কাজের প্রতি

---

৩১৯ من ولاه الله عز وجل شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره- *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল 'ইমারা, বাব নং-১৩

৩২০ ما من امام يغلق بابه دون ذوى الحاجة و الخلة والمسكنةالا اغلق الله ابواب السماء دون خلته و حاجته و مسكنته *সুনানু তিরমিযী*, কিতাবুল আহকাম, বাব নং-৬

Dhaka University Institutional Repository

যখন, উপেক্ষা প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন তাঁকে রাসূলে কারীম (স.) এর এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি অনতিবিলম্বে এ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন।[৩২১]

ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কাঠামোই যে জনকল্যাণমূলক, তা খিলাফতের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেছেন, "খলীফা (ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক) সে, যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং জনগণের প্রতি পিতার ন্যায় দরদ সহকারে স্নেহ ও দরদ প্রদর্শন করে।"[৩২২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম গরিব শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যাকাত ব্যতীত আরো অনেক ব্যবস্থা তৈরী করে রেখেছে যেন এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে অসহায় শ্রেণী তাদের মৌলিক প্রয়োজন পুরা করতে পারে, তাদের কাউকেই অভুক্ত অবস্থায় মরতে না হয়। ইসলাম এভাবেই গরীবের হক প্রতিষ্ঠা করার এবং বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশ যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নয় তাই এদেশে বায়তুলমাল ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগারই হলো বায়তুলমাল। বাংলাদেশে যে শাসন চালু আছে তাতে এদেশে যাকাত হতে প্রাপ্ত অর্থ বায়তুলমালের কোষাগারে রাখা সম্ভভ নয়। যেহেতু এদেশের ধনী সম্প্রদায় তাদের বাৎসরিক আয়ের শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ কর হিসাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয় সেহেতু তারা তাদের যাকাত বায়তুলমালে জমা দেয়না এবং জমা দেয়ার ব্যবস্থাও নেই। অথচ এদেশে বায়তুলমাল ব্যবস্থা চালু থাকলে এদেশের মানুষ কতইনা উপকৃত হত।

উশর

উশরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ এবং প্রচলিত ভাষায়: ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমগণের কল্যাণেই মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদিত শস্যের যে মাশুল আদায় করে তাকেই 'উশর' বলা হয়। বায়তুলমালের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে 'উশর'। যদি কোন গোত্র বা জাতি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের আবাদী জমি, আরবদের জমি, মুজাহিদীন ও গণিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত জমি, পরিত্যক্ত ও কোন মুসলিম কর্তৃক আবাদকৃত জমি এবং উত্তরাধিকারহীণ যিম্মীর মৃত্যুর পর মুসলিমগণের দখলে আসা জমিকেও 'উশরী জমি বলা হয়।[৩২৩]

---

[৩২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

[৩২২] ان الخليفة هو الذى يقضى بكتاب الله وليشفق على الر عية شفقة الر جل على اهله- আবূ 'উবায়দ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৩২৩] মাওলানা হিফযুর রহমান, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যিম্মী প্রজাকে পাট্টার উপর যে সরকারি জমি দেয়া হত তাকে বলা হত খারাজী জমি। এজন্য যিম্মী কৃষককে প্রতি বছর বায়তুলমালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর (খারাজ) জমা দিতে হত। কিন্তু খোদ মুসলিমগণরা আইনগতভাবে যে সমস্ত জমির মালিক ছিল সেগুলোকে বলা হত 'উশরী জমি। ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ('উশর) আদায় করত।

ফকীহরা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূ-সম্পত্তিকে মোট চার ভাগে ভাগ করেছেন। "(১) যে জমির মালিকানা ইসলাম গ্রহণ করেছে তা 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (২) যে জমি মুসলিমগণরা আবাদ করে তাও 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (৩) যে জমি মুসলিমগণরা তরবারির জোরে দখল করেছে, তাও 'উশরী জমির অন্তর্ভুক্ত। (৪) যে জমির মালিকদের সাথে মুসলিমগণের আপোষ-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা 'ফাই' এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর উপর খারাজ ধার্য করা হয়।"[৩২৪] মোট কথা, 'উশর একটি উৎপাদনশীল কর যা জমির উৎপাদনের উপর ধার্য করা হয়।

কৃষি উৎপাদন থেকে কর আদায় করা সম্পর্কে কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে, "যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিন তার হক প্রদান করবে।"[৩২৫] "হে মু'মিনগণ তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"[৩২৬]

হাদীসে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) বলেছেন, "যে জমির সেচ কাজ বৃষ্টি, ঝর্ণা কিংবা নদী থেকে হয়ে থাকে তার ফসলের দশ ভাগের একভাগ ('উশর) হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যে জমিতে (কূপ খনন করে) পানি সেচ করা হয় তার ফসলের বিশ ভাগের একভাগ গ্রহণ করতে হবে।"[৩২৭]

মুফাসসিররা শুধু আনাজ-তরকারি বা ফলমূলই নয় বরং খনিজ সম্পদকেও 'আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি'-এর অর্থাৎ জমির উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[৩২৮]

---

৩২৪ মাওয়াবদী, *আল আহকামুস সুলতানিয়া*, চতুর্দশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩২৫ كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده আল-কুর'আন, ৬ : ১৪১

৩২৬ يأيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض আল-কুর'আন, ২ : ২৬৭

৩২৭ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব ৎ-৫৫, হাদীস নং-১৪৮৩

৩২৮ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল বায়যাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়াআসরারুত তা'বীল* (মিশর: দার আল-কুতুব আল-আরাবিয়া, তা.বি) খ. ০১, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

খোদ রাসূলুল্লাহ্ (স.) 'উশর মাশুলের হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। "মু'আয ইবন জাবাল (সরকারি কর্মচারি হিসেবে) যখন ইয়ামানে ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে লিখেন, "যে জমি প্রবাহিত পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে 'উশর (১/১০ অংশ) এবং যে জমি চরকা অথবা বালতির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে নিসফে 'উশর (১/২০ অংশ) ধার্য বলে।"[৩২৯] বালতি অথবা চরকা দ্বারা সিক্ত জমির উপর নিসফে 'উশর ধার্যকরার যে কারণ ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন তা হল, "এ সমস্ত জমিতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সমস্ত জমি বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় সেগুলোতে অল্প পরিশ্রমেই কাজ চলে।"[৩৩০]

মোটকথা; মুসলিমগণের মালিকানাধীন জমির উৎপাদন থেকে আদায়কৃত করকেই 'উশর বলা হয়।

বাংলাদেশ যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়না তাই এদেশে উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথচ বাংলাদেশে উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন থাকলে এদেশের নাগরিকরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারত এবং দেশে শান্তি বিরাজ করত।

ওয়াক্ফ

আল্লাহ্র পথে খরচ করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে ওয়াক্ফ হল একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রচলন ও প্রসারের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবাগণ কার্যকর নযীর স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। বিত্তবানদের নিত্যদিনের জীবনের চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে। একব্যক্তি নিজের উপার্জিত অথবা অন্য কোন বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিজের জন্য হয়ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে। তা সত্ত্বেও সম্পদের মমতা ও আকর্ষণ অধিকাংশ সময় তাকে অভাবী ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু যখন তার জীবনের অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর লৌহকঠিন থাবার নিকট পরাজিত হয়ে পড়ে, কেবল তখনই সে অনুতপ্ত হয়ে ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের দৃশ্য সকাল-বিকাল প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও অন্তিম সময় আসার পূর্বে বিত্তবানরা এ ব্যাপারে কল্পনাও করে না। অথচ কত ইয়াতীম, অনাথ ও অন্যান্য গরীব-দুঃখীর করুণ ফরিয়াদ বিত্তবানদের লোভের সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরে বার বার আঘাত করে মৃত্যুবরণ করে। এ জন্য ইসলাম বিত্তবানদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিলতি দূর করা এবং তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রেরণা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, বিত্তবানদের ধন-সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করা ও সামাজিক জীবন উন্নত করার একটি পন্থা হল মানুষ মৃত্যুর লৌহকঠিন অবস্থা সবার আয়ত্বে আসার আগে সুস্থ-স্বজ্ঞান অবস্থায় তার সম্পদের একটি অংশ সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করবে। আর এরূপ দানের নাম হল 'ওয়াক্ফ'। অন্য কথায় যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় তথা জনসাধারণের জন্য দিয়ে দেয়া হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওয়াক্ফ' বলে। একে 'সাদাকায়ে জারিয়া'ও বলা হয়।

---

[৩২৯] আবূ 'উবায়দ আল কাসিম ইবন সালাম, *কিতাবুল আমওয়াল* (ইসলামাবাদ: ইদারাতু তাহকীকাতে ইসলামী, ১৯৮৬), পৃ. ৪৭৬; বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩৩০] শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবূ বকর, *আল-হিদায়া* (করাচী: কালাম কোম্পানী, তা.বি), খ. ১, কিতাবুয যাকাত।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্ফ আইন ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধনী লোক তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁদের সম্পদ গরিবদের দান করে যান। মৃত্যুর পর তার সম্পদ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এগুলি প্রত্যেক এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এর সঠিক প্রয়োগ হচ্ছেনা। দেখা যায় কিছু লোক তাদের স্বার্থ অনুযায়ী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। অথচ বাংলাদেশে পুরোপুরি এ ব্যবস্থা চালু করা যায় এবং ওয়াক্ফার দ্বারা দরিদ্র শ্রেণী উপকৃত হতে পারে।

সাদাকাতুল ফিতর

রমযান মাস শেষ হওয়ার পর 'ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন প্রত্যেক ধণী মুসলিম গরীবদেরকে যে খাদ্য বা অর্থ প্রদান করে তাকে 'সাদাকাতুল ফিতর' বলা হয়। মুহাদ্দিসরা তাকে 'যাকাতুল ফিতর'ও বলে থাকেন। হাদীস ও অন্যান্য প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরয হওয়ার আগেই 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করার আদেশ জারি করেছিলেন।[৩৩১] এ সাদাকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। ফিতরা রমযান পূর্ণ করার পর এবং 'ঈদুল ফিতরের পূর্বে আদায় করতে হয়। ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পেছনে দু'টি হিকমত রয়েছে:

(১) রমযান মাসে রোযাদার কর্তৃক সংঘটিত ছোট-খাট পাপ এর দ্বারা মাফ হয় অর্থাৎ ফিতরা হল গুনাহের ক্ষতিপূরণ।

(২) ফকীর-মিসকীনকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা যে, মুসলিম সমাজ তাদেরকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যায়নি বরং তাদের কথা খেয়াল রেখেছে, ঈদের দিনে তাদেরকে ভাই-বোন বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের আনন্দে তাদেরকে শরীক করেছে।

বাংলাদেশের সচ্ছল ব্যক্তিগণ প্রতি বছরই ফিতরা আদায় করে থাকেন। এক্ষেত্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু না থাকলেও সচ্ছল ব্যক্তিগণ নিজ উদ্যোগেই ফিতরা আদায় করে থাকেন। বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থায় এ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব।

খারাজ

বিজিত দেশের যেসব খলীফা বিজিত দেশের কৃষি জমিকে তাদের অধিকারেই থাকতে দিয়েছেন, যেসব অমুসলিমগণের সাথে আপোস ও সন্ধি হয়েছে এবং তারা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও আশ্রয় লাভ করে যিম্মিত্ব গ্রহণ করেছে তাদের জমি-জমাকে খারাজী জমি বলা হয় আর খলীফা এসব জমির উপর যে কর ধার্য করেন তাকে বলা হয় খারাজ।[৩৩২]

---

৩৩১ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মুলূক* (ব্রিল: ১৯৬৪), ২য় হিজরীর ঘটনা, পৃ. ১২৮১

৩৩২ মাওলানা হিফযুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

খারাজের অর্থ হচ্ছে, ভূমি ব্যবহার করার সে সরকারি বিনিময়, যা ইসলামী রাষ্ট্র তার যিম্মী প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে। ভূমি জরিপ এবং ভূমির উৎপাদনকে যাচাই করার পর সরকার নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। ইসলাম পূর্ব যুগে মিসর, সিরিয়া, ইরাক এবং ইরানের প্রজাসাধারণের কাছ থেকে খারাজ এবং জিযিয়া এ দু'ধরণের করই আদায় করা হত। রোমীয় এবং ইরানী উভয় সাম্রাজ্যেই এ কর প্রচলিত ছিল।

মোট কথা হযরত 'উমর (রা.) বিজিত ভূ-সম্পত্তি বন্টন না করে জনস্বার্থের খাতিরেই সাবেক কৃষকদের দখলে তা রেখে দেন এবং কৃষকরা নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে থাকে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় উপরিউক্ত ভূ-সম্পত্তিকে 'খারাজি আরদিয়াত' বলা হত। 'খারাজি আরদিয়াতে'র মালিক ছিল বায়তুল মাল অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম সমাজ।

হযরত 'উমর (রা.) ইরাকের কোন কোন অঞ্চলে প্রতি জারীবে এক কা'ফীয এবং এক দিরহাম ভূমিকর নির্ধারণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে কিসরা ইবন কুবাযের (শাহ ইরান) অভিমতই গ্রহণ করেছিলেন।"[৩৩৩]

এভাবে হযরত 'উমর (রা.) আবশ্যকীয় সংস্কার সাধনের পর মিসরে বহু যুগ থেকে প্রচলিত ফেরা'উনী এবং রোমীয় ভূমিকর ব্যবস্থা বহাল রাখেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত 'উমর (রা.) কৃষকদেরই জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে নিজ নিজ অধিকৃত জমি থেকে বেদখল করাকে তিনি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩৩৪]

বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র এবং এখানে অন্যান্য ধর্মের লোকও বাস করে (সহাবস্থান) কিন্তু অন্য ধর্মের কোন লোক এখানে জিম্মি নাই তাই এ ব্যবস্থা এখানে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

জিযিয়া

পূর্বতন ঐশী গ্রন্থধারী, অনারব মুশরিকরা যদি পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি জানায় এবং নিজেদের জান-মাল ও মান-ইয্যত রক্ষার শর্তে বার্ষিক কিছু কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নেয় এরূপ করকে 'জিযিয়া' বলা হয়। জিযিয়ার বিধান প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

---

[৩৩৩] আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া* (কায়রো: মাকতাবা আত-তাওফীকিয়্যাহ, তা.বি), এয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ১৪১

[৩৩৪] আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

"যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।"[৩৩৫]

বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র এবং এখানে অন্যান্য ধর্মের লোকও বাস করে (সহাবস্থান) । অন্য ধর্মের কোন লোক এখানে যে সুবিধা ভোগ করে মুসলিমগণরাও একই সুবিধা ভোগ করায় এখানে বাস্তবায়ন জিযিয়া ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

ফাই

মুসলিম বাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যদি অমুসলিমগণ নিজেদের ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় তাদের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদকে 'ফাই বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে ফাইয়ের সম্পদ বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব সম্পদ গণীমতের মাল লাভকারী ও মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। কেননা এ সব বিনা যুদ্ধেই লাভ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: "আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তার রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৩৬]

বাংলাদেশে মুসলিম ও অণ্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত হয় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী, তাই এখানে মুসলিমাগনের ভয়ে অমুসলিমগণ ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই এবং বাংলাদেশের বাস্তবতায় এ আইন কার্যকর এখানে সম্ভব নয়।

খুমূস

গণীমতের সম্পদ বণ্ট নের আগে এবং রিকায (মাটির নিচে প্রোথিত ও খনি থেকে আহরিত সোনা-রূপা ইত্যাদি) থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বে সে সবের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে। এটা রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রাপ্য। এ এক-পঞ্চমাংশকেই 'খুমূস' বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে গনীমতের সম্পদের উল্লেখ প্রসংগে বায়তুলমালের প্রাপ্য এ এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

---

৩৩৫ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون আল-কুর'আন, ৯ : ২৯

৩৩৬ وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير আল-কুর'আন, ৫৯ : ৬

Dhaka University Institutional Repository

"আর জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি বান্দার উপর নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"বিশুদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রিকায বা প্রোথিত বস্তুতেও খুমূসের বিধান রয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "রিকাযের মধ্যে খুমূস' ওয়াজিব।"[৩৩৭]

আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থে রিকায বলা হয় প্রোথিত বস্তুকে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নবী (স.) থেকে বর্ণিত একটি উদ্ধৃতিতে 'রিকায়ে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছেন, নবী (স.) নিকট জিজ্ঞেস করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! 'রিকায' কি বস্তু? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যে সব সোনা-রূপা সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ খনি)।"[৩৩৮]

বাংলাদেশের সরকার যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ সরাসরি নিয়ন্ত্রন করে তাই এখানে এ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

লা-ওয়ারিস মাল

লা-ওয়ারিস মালও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি উৎস। যেহেতু রাষ্ট্রকে দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করা হয়, তাই আইনসম্মতভাবেই মৃত ব্যক্তির লা-ওয়ারিস মাল জাতীয় সম্পদের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ইসলামী আইনও রাষ্ট্রের এ অধিকারকে সমর্থন করেছে। অতএব বায়তুলমালই হবে লা-ওয়ারিস মালের নিরঙ্কুশ অধিকারী।

কোন মুসলিম কিংবা যিম্মী যদি মৃত্যু হয় এবং তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। অনুরূপ যদি কোন যিম্মী বিদ্রোহী হয়ে কিংবা আল্লাহ না করুন, কোন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারব বা বিধর্মী রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তবে তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং বায়তুলমালের মালিকানায় চলে যাবে।[৩৩৯]

---

৩৩৭ وفى الر كاز الخمس, *সহীহ্ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাব নং-৬৬, হাদীস নং-১৪৯৯

৩৩৮ কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩৩৯ আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কা'সানী, *বাদায়েউস্ সানা'য়ে ফী তারতীবিশ শারা'য়ে* (মিসর: মাতবা'আতুল জামালিয়া, ১৯১০), খ. ৭, কিতাবুস সিয়ার, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

লা-ওয়ারিস মালের উপর চাই তা স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম আবূ হানীফা বলেন 'যার কোন উত্তরাধিকারী নেই তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তার পক্ষ থেকেই সাদাকা হিসেবে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে খরচ করা উচিত।' ইমাম শাফেয়ী বলেন, "লা-ওয়ারিস সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণার্থেই ব্যয় করা হবে। কেননা প্রথমে এর মালিক ব্যক্তি বিশেষ হলেও বায়তুলমালে দাখিল করার পর তা সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।"[৩৪০] লা-ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তি নিহত হলে তার রক্তমূল্যও বায়তুলমালে দাখিল করা হবে।

বাংলাদেশে যেহেতু ইসলামী শাসন প্রচলিত নেই তাই এখানে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি তার নিকট আত্মীয়রাই পেয়ে যায়। অবশ্য সেটা ধর্ম অনুযায়ীই বাস্তবায়িত হয়।

---

[৩৪০] মাওরদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, সপ্তদশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এ গবেষণায় প্রথমে সামাজিক নিরাপত্তার ধরন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ক্ষেত্র ও পরিসীমা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছু Rules ও তার ব্যবহারের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ কতৃক তৈরি এসব নিয়মে অনেক কল্যাণকর দিক থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে এবং এগুলো সব ক্ষেত্রে যে স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি তাও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে যে Constitutional Rules চালু আছে তাতে দেশ স্বাধীনতার ৪১ বছর পরেও এদেশের জনগোষ্ঠী তার সুফল পায়নি। আজ সর্বক্ষেত্রে যে হাহাকার, নৈরাজ্য, বিরাজ করছে।

এরপর এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সারা কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় জীব-জন্তু ও মানুষকে রিযিক দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে সমগ্র আসমান ও যমিন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থিত সমস্ত শক্তি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, মেঘ-বৃষ্টি, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গাছপালা-তৃণলতা সহ পুরো প্রকৃতিকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রন করে রেখেছেন। একমাত্র মানুষকে তিনি রিযিক সন্ধান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) রিযিক সন্ধানের উপায় সমূহ বাতলে দিয়েছেন। মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী রিযিকের সন্ধানে লেগে যায় তাহলে কোন মানুষই রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকবে না- তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলে দিয়েছেন। মূলতঃ আল্লাহপাক রব্বুল আলামীন মানুষের জন্য যে জীবন বিধান দিয়েছেন, সে বিধানই মানুষকে রিযিকের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

পরবর্তীতে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রে শাসকরা আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষসহ সকল প্রাণী, জীব-জন্তুর রিযিক তথা সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য দায়িত্বশীল। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে পরকালে তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হয়েছে। তাঁদের শাসনামলে অসহায়, অবহেলিত, নিঃস্ব জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এবং চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের উপায়সমূহ বিশেষ করে কাজ করা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব পালন, যাকাত ব্যবস্থা, বায়তুল মালের দায়িত্ব পালন, যাকাত ছাড়া মালের অন্যান্য হক আদায়, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় ও ছাদাকা বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইয়াতিম, বিধবা, বেকার, শ্রমিক ও অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরাধিকার, সুদ নিষিদ্ধকরণ, ওসিয়ত, আমানত, করযে হাসানা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অর্থ জমা করা ও তা বেকার পড়ে থাকারও (Idle Money) কঠোর সমালোচনা করেছে। ইসলামে প্রত্যেক ধরণের নগদ সম্পদ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছলেই তার যাকাত ফরয হয়। এ সম্পদের মালিক তা থেকে উপকৃত হোক বা না হোক কিছু আসে যায় না। এ নিয়মে প্রত্যেক বিত্তশালীদের ব্যবসায় নিজের পুঁজি বিনিয়োগে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ বছর বছর তার যাকাত দিতে দিতেই যেন তার অর্থ শেষ হয়ে না যায়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সে সমাজে ফকির ও বেকার থাকে না এবং বিত্তশালীরা নিজের সম্পদ ব্যয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে। ফলে সমস্যা সহজেই সমাধান হয়।

মানুষ আদর্শিক নীতির তুলনায় বাস্তব ঘটনা বেশি বিশ্বাস করে। এখানে কতিপয় জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা কায়েমের মাধ্যমে দরিদ্র ও বুভুক্ষাকে ইসলামী ব্যবস্থা কিভাবে মুকাবিলা করেছে এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে কেমন করে স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তির জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এ জীবন ব্যবস্থা আজও উত্তম ফল দিতে পারে যদি তা ভালভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জারী করা হয় ও তার আহকাম এবং হিদায়াত থেকে পুরোপুরি ফায়দা নেয়া হয়। এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা, সার্বিক সুখ-শান্তি এবং সামষ্টিক কল্যাণের এক নবতর যুগের সূচনা হবে।

রাসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাল পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে, ইসলাম এবং ইনসাফ কায়েমের কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিমগণকে কিভাবে ধনবান, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দৃঢ় করেছিল। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিশ্বে আর কায়েম হয়নি। কথিত আছে হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলে বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খেত।

মুসলিম জাতি দুর্ভাগ্যবশত এ নযিরবিহীন জীবনব্যবস্থার বরকত থেকে আজ বঞ্চিত রয়েছে। তার কারণ হল, যালিমরা তার উপর জোরপূর্বক চেপে বসে আছে এবং ধনসম্পদের উপর পুরোপুরি দখল প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ বিশ্বে ৫৭ টি মুসলিম দেশ রয়েছে যারা ও.আই.সি'র সদস্য। কিন্তু আমাদের জানা মতে একটি রাষ্ট্রেও ইসলাম ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা কায়েম নাই। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান ভাই ভাই। অতএব যখন কোন বিশেষ এলাকার বা দেশের বাসিন্দারা যাকাত এবং সাদাকার মুখাপেক্ষিহীন হয়ে যাবে এবং সেখানকার বিত্তবানদের যাকাত থেকে গরিবদের প্রয়োজনাবলী পূরণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তখন তা দিয়ে অন্য কোন এলাকার গরিবদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করা ফরয। বর্তমানে ও.আই.সি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামী বিশ্বে ইসলাম ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা কোথাও চালু আছে বলে আমাদের জানা নাই। এখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ তা বাস্তবায়ন করার মত সে সুযোগ ও শক্তি-সামর্থ তাদের রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে যে Constitutional Rules চালু আছে তাতে দেশ স্বাধীনতার ৪১ বছর পরেও এদেশের জনগোষ্ঠী তার সুফল পায়নি। আজ সর্বক্ষেত্রে যে হাহাকার, নৈরাজ্য, বিরাজ করছে। অথচ বাংলাদেশে যদি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু থাকতো যেমন, যাকাত, বায়তুল মাল, খারাজ, উশর,খামুস ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হত এবং পুরোপুরি ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হতো তাহলে এদেশে একজনও গরীব খুঁজে পাওয়া যেত না। ইসলামের সুবাতাস প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত।
সত্য প্রকাশের স্বার্থে এ কথা বলতে হয় যে, ইসলাম যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্দেশনা দিয়েছে তার কিয়দংশ আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া সহ অনেক অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে। তারা একে ধর্মের নামে প্রচার না করে সাধারণ মানবীয় মূল্যবোধ থেকেই সীমিত আকারে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

আজও যদি কোন রাষ্ট্রে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েম করা যায় তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে দারিদ্রের চির পরিসমাপ্তি ঘটবে। মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় জীবন কাটাতে পারবে এবং সমগ্র সমাজে দানের মুখাপেক্ষী কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান : *সমাজ কল্যানের ইতিহাস ও দর্শণ,ঢাকা: রোহেল পাবলিকেশন*, ২০০৫

ঃ *সমাজকর্মে সংশ্লিষ্ট ধারনা ও তত্ত্ব*, ঢাকা: *রোহেল পাবলিকেশন*, ২০০৫

ঃ *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজ কল্যান*, ঢাকা: *রোহেল পাবলিকেশন*, ২০০৫

২. অমর্ত্যসেন : *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*, কলিকাতা, ১৯৯৭

৩. আব্দুল করিম : *বাংলার ইতিহাস ও সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী,

ঃ *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী,

৪. শাহেদ আলী (সম্পাদিত) : *ইসলাসী সংস্কৃতির রূপরেখা*, সিলেট:১৯৬৭

৫. সাইয়েদ কুতুব : *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, শওদল প্রকাশনী*, ঢাকা:১৯৮৫

৬. খুরশীদ আহমদ : *ইসলামের আহবান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, ঢাকা- ২০০৩

৭. সৈয়দ আব্দুল লতিফ : *ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ*, ঢাকা:ইফাবা,১৯৯৮

৮. ফজলুল করিম : *আদর্শ মানব*, ঢাকা: *ইসলাম মিশন লাইব্রেরী*, ১৯৪৭

৯. মুহাম্মদ আব্দুর রহীন : *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, ইফাবা-১৯৮৭

১০. মুহাম্মদ আজরফ : *ইসলাম ও মানবতাবাদ*, ইফাবা-১৯৮০

১১. আল্লামা ইউসুফ আল কারজাবী : *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১

ঃ *ইসলামের যাকাত বিধান*, ইফাবা-১৯৮৩

১২. ইমাম আবু ইউসুফ : *কিতাবুল খারাজ*, করাচী-১৯৬৩

১৩. হিফজুর রহমান : *ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ইফাবা-১৯৮২

১৪. ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাযাহার : *রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর সরকার কাঠামো*, ইফাবা-২০০৪

১৫. মুফতি মুহাম্মদ শফি : *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা*: ইফাবা-১৯৮৬

১৬. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ইফাবা-২০০৫

১৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল : *সুনান ই আবু আউদ*, ঢাকা: ইসলামিক

Dhaka University Institutional Repository

আশআস সাজিসতানী — ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ,১৯৯৭

১৮. আবূ ঈসা তিরমিযী : *জামি' তিরমিযী,(আরবী) দেওবন্দ,* ইউ পি ইন্ডিয়া মোখতার এন্ড কোম্পানী

১৯. আইয়েদ কুতুব শহীদ : *তাফসীর ফি যিলাযিল কুরআন,*(বাংলা লন্ডন): আল কোরআন একাডেমী,১৯৯৯

২০. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী : *সহীহ্ মুসলিম,(আরবী) কায়রো:* আল-মাকতাবা রশীদিয়া,১৩৭৬ হি.

২১. ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল : *আল-মুসনাদ,(আরবী) কায়রো: মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়া,১৮৯৫*

২২. আলাউদ্দীন আলী আল মুত্তাকী ইবন হিসামুদ্দীন আল হিনদী : *কানযুল উম্মাল, (আরবী) বয়রুত, ম'আসসাতুর রসালাহ, ১৯৮৯*

২৩. ইবন হাযম : *আল-মুহাল্লা, (আরবী) মিশর, মাকতাবা আল-জমহুরিয়্যাহ আল-আরাবিয়্যাহ.১৯৬৯*

২৪. ইবন সাদ : *আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (আরবী) বয়রুত, দারু সাদেও.১৯৫৭*

২৫. ইমাম মালিক ইবন আনাস : মুয়াত্তা,(আরবী) কায়রো,১৯৫১

২৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,১৯৯৭*

২৭. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫*

২৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী : *ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী,২০০৩*

২৯. মাওলানা হিফযুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনু:মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১৯৯৮*

৩০. মাওলানা আশরাব আলী থানবী : *ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, অনু: কারামত আলী নিজামী, ঢাকা, শিরীন পাবলিকেশন্স-* ১৩৯৪ বাং

৩১. শেখ মাহমুদ আহমদ : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনু: মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-* ১৯৮০

৩২. মাওলানা আব্দুল আলী : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ফরিদপুর: ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,১৯৮০*

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. আবূল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবন হাবীব আল বাসরী আল-মওয়ারদী : *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, (আরবী) কায়রো, মিশর, মাকতবা আত- তাওফিকিয়া- তা.বি

৩৪. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী : *সহীহ বুখারী* ,(আরবী), নয়া দিল্লী, ইসলামিয়া বুক সার্ভিস- ১৯৯৭

৩৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : *মাসকালাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা ' আলাজাহাল ইসলামু'* (আরবী) কায়রো, মাকতাবাতু ওয়াহবা:২০০৩

৩৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : *ফিকহুয যাকাত*, (আরবী) বয়রূত, লেবানন, মু'আসসাতু আর-রিসালাহ:২০০০

৩৭. আবু ইউসুফ : কিতাবুল খারাজ, বয়রূত লেবানন, দারুল মারিয়া:১৯৭১

৩৮. আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ, *সুনানু নাসাঈ*, *(আরবী)* কায়রো, মাকতবা সালাফিয়া-১৯৮২

৩৯. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, *(আরবী) কায়রো, আল-মাকতাবা রশীদিয়া-* ১৩৭৬ হি.

৪০. সম্পাদনা পরিষদ : *আল-কুরআনুল করীম*, ঢাকা, ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ- ২০০৬

৪১. W.A Friedlander, *Introduction to Social welfare*, New Delhi.Prentice hall,1963.

৪২. Noel & Ritta timms, *Dictionary of Social welfare, Routledge* & kegun paul, Great Britain, 1977.

৪৩. Dr. rajendra kumar sarma,*Social problem and welfare*, Atlantic Publishers and distributors; New Delhi-1998G

৪৪. C. D Gorvin, *Social work in Contemporary Society*,New Delhi -1998

৪৫. G. R Madan, *Indian Social Problem*. New Delhi 1980

৪৬. Abdul karim, *Social history of muslims in Bengal*,Chittagong 1985

৪৭. Syed amir ali, *The sprit of islam,chatto & Windus London*,1992

৪৮. Imam abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari- Arabic- English, New Delhi, Islamia Book Service: 1997*

৪৯. Hammudah Abdalati, *Islam in force, Islamic teaching center*